POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ

এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে দাখিল করিব, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ প্রতিশ্রুতি।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১১৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 48

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

26 নভেম্বর, 2020 ● 10 রবিউস সানি 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

জুমআর দিন স্নান করা, তেল মাখা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার কল্যাণ

হযরত সালমান ফার্সি (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমআর দিন স্নান করে এবং সাধ্যমত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে, তেল মেখে এবং সুগন্ধি লাগিয়ে ঘর থেকে বের হয় আর দুই ব্যক্তির মাঝে ঢুকে তাদেরকে পৃথক করে দেয় না, অতঃপর তার জন্য নির্ধারিত নামায পড়ে এবং এরপর ইমাম যখন লোকেদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তখন সে নীরবে শোনে, তার সেই জুমআ থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত যত পাপ থাকবে সমস্ত ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(৮৮৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আমি যদি এ বিষয়ের কথা চিন্তা না করতাম যে আমি নিজ উম্মতকে কষ্টে নিপতিত করব কিম্বা তিনি বলেছেন, যদি মানুষের কষ্টের কথা আমি চিন্তা না করতাম, তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সঙ্গে অবশ্যই মেসওয়াক (দাঁতন) করার আদেশ দিতাম।

৮৮৮) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আমি তোমাদেরকে মেসওয়াক সম্পর্কে বার বার নির্দেশ দিয়েছি।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

এই সংখ্যায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৩ অক্টোবর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

ধন্য সেই ব্যক্তি যে পরকালের উপর দৃষ্টি রাখে।
পরকালের প্রতি দৃষ্টি রেখে মন্দকর্ম থেকে প্রায়ঃশ্চিত্ত করা মানুষের জন্য আবশ্যক।
কেননা, প্রকৃত আনন্দ এবং সত্যিকার সুখ এর মাঝে নিহিত।
সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে আযাব আসার পূর্বেই চিন্তা করে আর সেই ব্যক্তি দূরদর্শী যে বিপদ আসার পূর্বে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমাদের জামাতের জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তারা যেন নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন নিয়ে আসে। কেননা তারা তাজা মারেফাত তথা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কোনও ব্যক্তি যদি মারেফাত লাভের দাবি করে অথচ তার উপর আমল না করে, তবে তা কেবল মিথ্যা আস্ফালন হিসেবেই গণ্য হবে। অতএব অন্যদের অবহেলা আমাদের জামাতকে যেন উদাসীন না করে, আর তাকে অলস হওয়ার ক্ষেত্রে ধৃষ্ট না করে তোলে। তারা তাদের নিরুত্তাপ ভালবাসা দেখে নিজেদের হৃদয়কে যেন পাষান বানিয়ে না নেয়।

মানুষের আশা-আকাঙ্খা অনেক। কিন্তু অদৃষ্টের নিয়তি সম্পর্কে কে বলতে পারে? জীবন কামনা-বাসনা অনুসারে পরিচালিত হয় না। কামনা-বাসনার ধারা আর নিয়তির ধারা এক নয় আর শেষোক্ত ধারাটিই সত্য। মানুষের জীবনকাল সম্পর্কে খোদা অবগত আছেন। তাদের ভাগ্যের লেখনে কি লেখা আছে তা কে বলতে পারে? এই জন্যই মনকে অতন্দ্র রেখে চিন্তা করা দরকার।

তওহীদের একটি শ্রেণী এটিও যে, খোদা তা'লার ভালবাসায় নিজের যাবতীয় স্বার্থকেও বিসর্জন দেওয়া এবং নিজ অস্তিত্বকে তাঁর শ্রেষ্ঠতে বিলীন করে দেওয়া।

আপনারা সকলেই জানেন যে, মহাসম্মানিত আল্লাহ্ কুরআন শরীফে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসেও বলেছেন যে এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, আকাশ ও পৃথিবী আর যা কিছু পৃথিবী ও আকাশে আছে, সেগুলির কোনওটির নাম ও চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। কেবল খোদাই ছিলেন। এটিই ইসলামের ধর্মবিশ্বাস। ***'লাম ইয়াকুন মাআহু শাইয়া'*** অর্থাৎ খোদার সঙ্গে আর কোনও বস্তু ছিল না। তিনি আমাদেরকে কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে আরও এক যুগ আসবে যখন খোদার সঙ্গে কেউ থাকবে না। সেই যুগ অতীব ভয়ানক যুগ। যেহেতু এর উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মোমেন এবং মুসলমানের কাজ। আর যে এর উপর ঈমান আনে না সে মুসলমান নয়, কাফের এবং বেইমান। যেরূপে বেহেশত, দোযখ এবং আম্বিয়াগণের দ্বারা আনিত গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে সেই মুহূর্তের উপর ঈমান আনা আবশ্যক যখন বিগুল বাজানোর পর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এটিই আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত রীতি।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২২-২২৪)

আল্লাহর নিকট বৈধ বিষয়গুলির মধ্যে সব থেবে বেশি অপছন্দনীয় বিষয় হল তালাক।

কিছু বৈধ জিনিসকেও মানুষ নিজের জন্য, অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবের জন্য আবার অনেক সময় সমাজের কারণে ত্যাগ করে থাকে। বস্তুতঃ এমতাবস্থায় একজন মোমেন বৈধ বিষয়কে ত্যাগ করে খোদা তা'লার কারণে আর সে মনে করে, যেহেতু এই কাজ আমার আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়, তাই তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ আমি করব না। অতএব তালাকের বহুল ব্যবহার হিদায়তের পথ নয়, বরং তালাক থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করাই হিদায়াতের পথ। হালালের অর্থ, চাইলে করতে পার। আইনগতভাবে এটি বৈধ ঠিকই, কিন্তু তোমাকে অপরের ভাবাবেগের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসাও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। যে বৈধ বিষয়কে বাস্তবায়িত করতে গেলে অপরের স্বপ্নসমূহ, আবেগ অনুভূতি, সহানুভূতি এবং ভালবাসার মৃত্যু হয় সেটি হালাল নয়, বরং এমন হালাল একদিক থেকে হালাল হলেও অপর দিক থেকে হারাম। মানুষ যখন নিজের বন্ধু-বান্ধবের এবং সমাজের মানুষের অসন্তুষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে, তবে সে খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির বিষয়েই কেন এমন উদাসীন থাকবে। খোদা তা'লার অসিত্বই কি এমন দুর্বল, যার অসন্তুষ্টি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য নয়? যখন জাগতিক কোনও প্রেমী তার প্রেমাস্পদের তুচ্ছ তুচ্ছ

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ উগ্রপন্থার পরিবর্তে পৃথিবীর প্রয়োজন ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার। অতএব আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে ভাবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে হয়, তবে প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক শহর, এলাকা, দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক সহনশীলতা ও ভালবাসা সৃষ্টি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে আর এই কাজ করতে হবে সকলে মিলে। খোদা তা'লা বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও গোত্র সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি সকলকে একটি বিষয় মেনে চলতে বলেছেন, সেই নির্দেশটি হল- তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কথায় কর্ণপাত করবে না। বরং পরস্পারিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির প্রসার কর। আমরা এই শিক্ষাই সর্বত্র প্রচার করি এবং তা অনুশীলন করার চেষ্টা করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন-যেমনটি আমি এবং মেয়র সাহেব উভয়েই একথা ব্যক্ত করেছেন যে জামাত আহমদীয়ার এই মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত থেকে আমাদের মাঝে ভালবাসা ও সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। এখানে বিভিন্ন পার্লামেন্টিরিয়নও বক্তব্য রেখেছেন। রাজনীতিকগণও ভাষণ দিয়েছেন যে শান্তি বিনষ্টকারী অনেকেই আছে, যেমনটি আমিও বলেছি, তাদের কাজই হল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। অতএব আমাদেরকে বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলতে হবে আর প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের থেকে দূরে থাকা, এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল তৈরী করে, বিশৃঙ্খলা তৈরী করে, ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করে পৃথিবী কি অর্জন করতে পেরেছে?

বিগত দুটি মহাযুদ্ধে আমরা এটাই দেখেছি যে পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে আর কয়েক কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অতএব শান্তিই প্রকৃত বস্তু আর শান্তির মাধ্যমেই মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ভালবাসা ও পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে, অপরের ভাবাবেগের প্রতি যত্নশীল থাকার মাধ্যমে। অতএব এই কথাগুলি সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদেরকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বস্তরে ভালবাসার প্রসার করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কুরআন করীম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে তোমরা প্রত্যেক ধর্মের ইবাদতকারীদের এবং প্রত্যেক ধর্মের উপাসনাগারের নিরাপত্তা বিধান করবে। কুরআন করীমে এই আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, যদি এই সব বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী এবং ধর্মের বিনাশকারীদের হাত প্রতিহত না কর, তবে কোনও চার্চ, সিনাগগ, ইবাদতগাহ, মসজিদ কিছুই এদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। অর্থাৎ এখানে এসে ইবাদতকারীদের অন্তরে বিশৃঙ্খলা ও কলহ সৃষ্টি করে দিবে। যার ফলে এখানে মসজিদে বা উপাসনাগারগুলি থেকে প্রেমের বাণী প্রচারের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলার শিক্ষা বিতরিত হবে। এছাড়াও এরা চায় না যে পৃথিবীতে ভালবাসার জায়গা তৈরী হোক। অথচ যতগুলি ধর্মীয় উপাসনাগার আছে সবগুলিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভালবাসার শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে। অতএব কুরআন করীম আদেশ দেয় যে তোমরা কেবল মসজিদ রক্ষা করেই ক্ষান্ত হয়ো না, বরং প্রত্যেক ধর্মের উপাসনাগার রক্ষা কর।

কাজেই এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাই আমরা মেনে চলি আর এই ব্যবস্থাপত্রই কুরআন করীম আমাদেরকে দিয়েছে। যার ফলে পরস্পরের ধর্মের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয় আর অপরের সঙ্গে সম্পর্কও তৈরী হয় আর একে অপরের আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবানও থাকা যায়। কুরআন করীম আমাদের এই শিক্ষাও দেয় যে, তোমরা পৌত্তলিক এবং তাদের প্রতিমাগুলিকে মন্দ বলো না। কেননা প্রত্যুত্তরে তারাও তোমাদের খোদাকে দোষারোপ করবে। পরিণামে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আর মুসলমান এই বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হোক তা আল্লাহ্ তা'লা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবেন না। আর যারা এই ধরণের কাজে লিপ্ত, যারা বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি করছে, সে মুসলমান হোক বা এমন ব্যক্তি হোক যে ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে, সে ইসলামের দুর্নামই ডেকে আনে। ইসলামের শিক্ষা হল ভালবাসা, আর যদি কোথাও কঠোরতা অবলম্বনের আদেশ থাকে তবে তা শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে, কোনও দুরভিসন্ধি পুরণের উদ্দেশ্যে নয়। অনুরূপভাবে একজন প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল বিশ্বের সমস্ত ধর্মের প্রবর্তকদের প্রতি সম্মান জানানো। আর আমরা সকল আম্বিয়াকে মান্য করি আর সকলকে সম্মান করি। এই কারণেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে আমরা আবেদন করব, আপনারাও যেন ইসলামের প্রবর্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, যাতে পৃথিবীতে শান্তি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত থাকে আর মুসলমানদের ভাবাবেগ আহত না হয় আর ভালবাসার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত রেখে একে অপরের মন জয়কারী হোন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমাদের বলেছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, যারা নবী হয়ে এসেছেন, ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয় তাঁরা সত্যবাদী ও পুণ্যবান ছিলেন। তাঁরা পবিত্রচেতা এবং মানুষের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। সেজন্যই কোটি কোটি মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করেছে, তাঁদের অনুগামী হয়েছে। অতএব যারা কোটি কোটি মানুষের অবস্থা পরিবর্তন করেছেন, তাদেরকে খোদার সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দিয়েছেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা তৈরী করার চেষ্টা করেছেন, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা আমাদের কর্তব্য।

কাজেই এটিই হল এই মসজিদের উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক সেই মসজিদের উদ্দেশ্য যা জামাত আহমদীয়া পৃথিবীতে স্থাপন করে। আর যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২০৬টি দেশে জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন দেশে মসজিদ তৈরী হচ্ছে, গ্রামে-গঞ্জেও তৈরী হচ্ছে। আর সর্বত্রই আমরা ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার প্রসার করছি। আর এই অপূর্ব সুন্দর শিক্ষাই বিভিন্ন দেশ ও জাতিতে আপনারা দেখতে পাবেন। আর এটিই জামাত আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য যে আপনি যেখানেই যান, আফ্রিকার দেশসমূহ কিম্বা আমেরিকা, ইউরোপ বা এশিয়া, সুদূর প্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া কিম্বা দক্ষিণ আমেরিকা, আপনি যে কোনও দেশেই যান না কেন, সেখানে দেখবেন আমাদের প্রত্যেক আহমদী একদিকে যেমন এই বার্তা দিবে যে এক খোদাকে সনাক্ত কর, তাঁর ইবাদত কর, তেমনি এই বার্তাও দিবে যে নিজেদের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধে পরিবেশ বজায় রাখ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই কথাগুলি বলার পর আমি জামাত আহমদীয়ার সদস্যদেরকেও বলব যে এখন এই মসজিদ তৈরী হওয়ার পর সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আপনাদের উপর আগের চেয়ে বেশি নিবদ্ধ হবে। আপনারা এই মসজিদের যে দুটি মিনার তৈরী করেছেন, তা কেবল সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়, বরং এগুলি ভালবাসা, শান্তি এবং এক খোদার ইবাদতের প্রতীক হওয়া উচিত এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতীক হওয়া উচিত যার জন্য এটি তৈরী হয়েছে। তাই যখনই এই মসজিদে আসবেন, এই মানসিকতা নিয়ে আসবেন যে আপনি কেবল নিষ্ঠা সহকারে খোদা তা'লার ইবাদত করবেন এবং যথার্থরূপে তাঁর ইবাদত করবেন। পারস্পরিক ভালবাসা নিয়ে থাকবেন, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটাবেন এবং শান্তির বার্তা দিবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, তোমরা যখন মসজিদে আস, তখন তোমাদের উদ্দেশ্য থাকবে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। আর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পরেই তোমরা এক খোদার ইবাদতকারী হবে। আর একত্ববাদ তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তোমরা একে অপরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হও। কতক ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে পিছিয়ে থাকে, কতক এগিয়ে থাকে। আর যখন জামাত হিসেবে সমবেত হয়ে নামায পড়বে, সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, একে অপরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, তখন একে অপরের কাছ থেকে জ্যোতি লাভও করবে। কাজেই যদি একে অপরের কাছ থেকে জ্যোতি লাভ করতে হয়, তবে সেই জ্যোতি থেকে অংশ পেতে গেলে নিজেকেও চেষ্টা করতে হবে। আর এই চেষ্টাই করতে হবে যে আমি নিজের ভাইয়ের কাছ থেকেও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব গ্রহণ করব আর নিজের আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে তাকেও অংশ দিব। আর তা তখনই সম্ভব, যখন আপনি প্রকৃত অর্থে খোদা তা'লার ইবাদতের মাধ্যমে স্বার্থক ইবাদতকারী হবেন এবং তাঁর বান্দাকে প্রাপ্য অধিকার দিবেন।

হুযুর আনেয়ার বলেন- আল্লাহ করুন এই মসজিদ এই সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হোক আর আপনারা পরস্পর নিজেদের অধিকার প্রদানকারীও হোন। খোদার অধিকার প্রদানকারীও হোন আর প্রতিবেশীদের অধিকার সমূহ প্রদানকারীও হোন আর এই শহরের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার প্রদানকারী হোন এবং ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির শিক্ষাকে পূর্বের থেকে বেশি এই শহরে প্রসারকারী হন। যাজাকাল্লাহ॥

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

হে মুআয! আমি তোমাকে তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এই যিকির করবে আর এটিকে তুমি কখনো পরিত্যাগ করবে না, অর্থাৎ তুমি বল, *'আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরেকা ওয়া শুকরেকা ওয়া হুসনে ইবাদাতিকা'*।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান হল, তুমি আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা আর আল্লাহ্‌র জন্যই ঘৃণা কর। নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত রেখো আর মানুষের জন্য তুমি তা-ই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তাদের জন্য তুমি সেই জিনিস অপছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ কর।

কুরআনের ক্বারী মহানবী (সা.) মর্যাদাবান বদরী সাহাবী হযরত মুয়ায়েয বিন জাবাল (রা.) এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

তিন জন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ,যাঁরা হলেন- মৌলবী ফারযান খান (মুবাল্লিগ ইনচার্জ, খুরদা,উড়িষ্যা), মাননীয় আব্দুল্লাহ্ মুলসিকো সাহেব (মিশনারী, মালেয়েশিয়া) এবং মাননীয় আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (মুয়াল্লিম, কাদিয়ান)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৩ অক্টোবর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২৩ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)। তার নাম ছিল মুআয, পিতার নাম জাবাল বিন আমর এবং মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে সাহাল্, যিনি জোহায়নাহ গোত্রের রাবাহ শাখার সদস্যা ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর ডাক নাম ছিল আব্দুর রহমান, তিনি খাযরাজ গোত্রের উদাঈ বিন সা'দ বিন আলী শাখার সদস্য ছিলেন। সিয়ারুস্ সাহাবার প্রণেতা লিখেন, সা'দ বিন আলীর দুই পুত্র ছিল সালেমা এবং উদাঈ। বনু সালেমা সালেমার বংশধর। ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে উদাঈ বিন সা'দ এর বংশের কেবল দু'ব্যক্তি বাকি ছিল, একজন হযরত মুআয আর দ্বিতীয়জন তার পুত্র আব্দুর রহমান। বনু উদাঈ'র বসতি বা বাড়িঘর বনু সালেমার বসতিস্থলের পাশেই অবস্থিত ছিল। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) ছিলেন খুবই ফর্সা ও সুদর্শন, ঝকঝকে দাঁত এবং কাজলকৃষ্ণ চোখ বিশিষ্ট। তিনি স্বজাতির যুবকদের মধ্যে খুবই সুদর্শন যুবক এবং অধিক দানশীল ছিলেন। আবু নঈম বর্ণনা করেন, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) আনসারী যুবকদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, লজ্জা-সম্ভ্রম এবং উদারতায় অগ্রগামী ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে সত্তরজন আনসারীসহ যোগদান করেন আর ইসলাম (ধর্ম) গ্রহণ করার সময় তার বয়স ছিল আঠারো বছর। তিনি (রা.) বদর, উহুদ ও পরিখাসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি (রা.) তখন যোগদান করেন যখন তার বয়স ছিল কুড়ি বা একুশ বছর। তার বৈপিত্রেয় ভাই (অর্থাৎ এমন ভাই যাদের মা অভিন্ন কিন্তু পিতা ভিন্ন ভিন্ন) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ্দ (রা.)ও বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। 'উসদুল গাবাহ্' অনুসারে তার বৈপিত্রেয় ভাইয়ের নাম ছিল, সাহাল বিন মুহাম্মদ বিন জাদ্দ আর সাহাল বনু সালামা গোত্রভুক্ত ছিলেন, এ কারণে বনু সালামা তাকেও নিজেদের গোত্রভুক্ত জ্ঞান করত। মুহাজিররা যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মহানবী (সা.) মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন।

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে শুধু এই উদ্ধৃতিটিই লিপিবদ্ধ আছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বনু সালামার যুবকদের সাথে মিলিত হয়ে বনু সালামার প্রতিমা ভেঙেছিলেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ:১৮৭) (সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০৭-১০৮)

পূর্বে অপর এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল যে, তিনি কীভাবে নিজেদের পারিবারিক প্রতিমা ভেঙেছিলেন, এখানে পুনরায় বর্ণনা করছি। হযরত আমর বিন জমুহ্ তার নিজ বাড়িতেই কাঠের একটি প্রতিমা বানিয়ে তার নামকরণ করেছিলেন মানাত এবং সেটিকে তিনি খুবই সম্মান করতেন। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় বনু সালামার কতক যুবক বয়আত করে (আর) তাদের মধ্যে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)ও ছিলেন। স্বয়ং আমরের পুত্র মুআযও বয়আত করেছিল। আমি বলেছি যে, এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে আর তা করা হয়েছে মুআয বিন আমর (রা.)-এর প্রেক্ষাপটে। তিনি বলেন, তিনি তার পিতা আমরকে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য যেভাবে পরিকল্পনা করেন তাহলো, হযরত আমরের সেই প্রতিমা, যেটিকে তিনি নিজ বাড়িতে সাজিয়ে রেখেছিলেন; রাতের বেলা তুলে নিয়ে আবর্জনার স্তূপে ফেলে আসতেন আর (এ কাজে) তিনি যেসব যুবকের সহযোগিতা নিতেন তাদের মধ্যে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)ও ছিলেন। যাহোক, একদিন তারা (সেই প্রতিমাকে) নিয়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। আমর খুঁজে বের করে সেটিকে আবার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন আর বলেন, আমি যদি তার সম্পর্কে জানতে পারি যে আমার প্রতিমার সাথে এমনটি করছে তাহলে আমি তাকে শিক্ষণীয় শাস্তি দিব। পরের দিন সেই যুবকরা আবার সেই প্রতিমার সাথে একই আচরণ করে এবং পুনরায় প্রতিমাটি গর্তের মধ্যে উল্টো অবস্থায় পড়ে থাকে। তিনি পুনরায় সেটি উঠিয়ে নিয়ে আসেন। তৃতীয় দিন তিনি আবারও সেই মূর্তিটি পরিষ্কার করে সাজিয়ে আগের স্থানে রাখেন এবং তার গায়ে নিজের তরবারিটি ঝুলিয়ে দেন। প্রতিমাটিকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না তোমার সাথে কে এমন ব্যবহার করে। তবে এখন আমি তোমার কাছে আমার তরবারি রেখে যাচ্ছি। নিজের নিরাপত্তা বিধান তুমি নিজেই করে নিও, কেননা তোমার কাছে তরবারি আছে। পরের দিন হযরত আমর (রা.) পুনরায় দেখেন যে, মূর্তিটি স্বস্থানে নেই এবং এলাকার সেই গর্তটিতে একটি মৃত কুকুরের গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় সেটি পাওয়া যায়। এটি দেখে তিনি খুবই অবাক হন এবং একান্ত চিন্তিত হয়ে একথা ভাবতে বাধ্য হন যে, যে প্রতিমাকে আমি খোদা বানিয়ে রেখেছি, পাশে তরবারি থাকা সত্ত্বেও নিজের নিরাপত্তা বিধান করার মতো ক্ষমতাও এর নেই; তাহলে সে আমার নিরাপত্তা বিধান কীভাবে করবে? অধিকন্তু মৃত কুকুর এর গলায় বাঁধা রয়েছে; সুতরাং এটি কীভাবে খোদা হতে পারে? যাহোক, এবিষয়টি তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত মুআয বিন জাবালের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা কেমন ছিল তা নিম্নের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। ঘটনাটি হলো, উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় ফেরত আসেন, তখন শহরের অলিগলি থেকে ক্রন্দনরোল ভেসে আসছিল। তিনি (সা.) প্রশ্ন করেন, এটি কী? তিনি উত্তরে বলেন, আনসারদের নারীরা তাদের শহীদ আত্মীয় স্বজনদের জন্য আহাজারি করছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হামযা (রা.)-এর জন্য কি বিলাপ করার কেউই নেই? তিনি (সা.) হযরত হামযা (রা.)-এর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। যখন হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত সা'দ বিন উবাদা, হযরত মুআয বিন জাবাল এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.) একথা শুনে নিজ-নিজ পাড়ায় গিয়ে মদিনার বিলাপকারিণীদের একত্র করে নিয়ে আসেন এবং বলেন, এখন আনসার শহীদদের জন্য আর কেউ কাঁদবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর চাচার জন্য না কাঁদবে, কেননা তিনি (সা.) বলেছেন, মদিনায় হামযার জন্য রোদন করার কেউ নেই! এটি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। চাচার কারণে মহানবী (সা.)-এর এত কষ্ট অনুভব হয়েছে।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, প: ৯৫-৯৬)

যদিও ক্রন্দন এবং বিলাপ নিষিদ্ধ, কিন্তু এখানে মহানবী (সা.) কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন অথবা মানুষের আবেগকে লক্ষ্য করে বলেন যে, হায়! যদি হামযার জন্য এমন আবেগের বহিঃপ্রকাশ হতো। কিন্তু যাহোক এমন বিলাপ করা সাধারণত ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী (সা.) স্বয়ং এটি নিষেধ করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হুনায়েন অভিমুখে যাত্রা করেন। হুনায়েন মক্কার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তায়েফের একটি উপত্যকা। তিনি (সা.) হযরত মুআয বিন জাবালকে মক্কাবাসীদের ধর্ম শেখানো ও কুরআন পড়ানোর জন্য নিজের অবর্তমানে মক্কায় রেখে যান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ,২৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০৯)

হযরত মুআয বিন জাবাল তাবুকের যুদ্ধে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় রয়ে যাওয়া হযরত কা'ব বিন মালেক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন বনু সালমার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত কা'ব বিন মালেকের কুৎসা করে। তখন হযরত মুআয বিন জাবাল সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা তো তার মাঝে ভালো গুণই দেখেছি, কোন মন্দ বিষয় তো দেখি নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪৪১৮)

এটি ছিল উন্নত চরিত্র, অর্থাৎ কারো অবর্তমানে তার দোষত্রুটি বলে বেড়ানো সমীচীন নয়। কাতাদা বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাসকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে চারব্যক্তি কুরআন সংকলন করেছেন; তারা সবাই আনসার ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত যায়েদ বিন সাবেত এবং হযরত আবু যায়েদ। হযরত আবু যায়েদ হযরত আনাসের চাচা ছিলেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-২৪৬৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শিখ, অর্থাৎ ইবনে মাসউদ, আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম, উবাই বিন কা'ব এবং মুআয বিন জাবাল-এর কাছ থেকে।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৮০৬)

এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। এর পূর্বে হযরত কা'ব-এর স্মৃতিচারণেও এর কিছুটা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) পবিত্র কুরআন পড়ানোর জন্য একদল শিক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, যারা পুরো কুরআন মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে মুখস্ত করে লোকদের পড়াতেন। এই চারজন ছিলেন শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষক, যাদের কাজ ছিল মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শিখে মানুষকে কুরআন শেখানো। এছাড়া তাদের অধীনে এমন আরো অনেক সাহাবী ছিলেন, যারা মানুষকে পবিত্র কুরআন পড়াতেন। বিশিষ্ট এই চার শিক্ষকের নাম হলো- আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব। এদের প্রথমোক্ত দু'জন মুহাজের আর অপর দু'জন আনসার। পেশার দিক থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ছিলেন শ্রমিক, সালেম ছিলেন একজন মুক্ত ক্রীতদাস, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব মদিনার নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মোটকথা মহানবী (সা.) সকল শ্রেণি গোষ্ঠিকে দৃষ্টিপটে রেখে সব শ্রেণিগোষ্ঠি থেকে ক্বারি বা কুরআনের শিক্ষক নির্ধারণ করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন, ***'খুযিল কুরআনা মিন আরবাআতিন, মিন আব্দিল্লাহিল মাসউদিন, ওয়া সালেমিন ওয়া মুয়ায ইব্নে জাবালিন, ওয়া উবাই বিন কা'বিন'।*** অর্থাৎ যারা কুরআন পড়তে চায় তারা এই চার জনের কাছে কুরআন পড়ে নিক। তারা হলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, সালেম, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব।

এই চারজন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা পুরো কুরআন মহানবী (সা.)-এর কাছে শিখেছেন বা মহানবী (সা.)-কে শুনিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। এছাড়াও আরো অনেক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে সরাসরি যতটা সম্ভব পবিত্র কুরআন শিখতেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ একবার একটি শব্দকে ভিন্নভাবে পড়লে হযরত উমর তাকে বাধা দিয়ে বলেন, এভাবে নয় বরং এভাবে পড়া উচিত। এতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, না, আমাকে মহানবী (সা.) এভাবেই শিখিয়েছেন। হযরত উমর তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং রসূলুল্লাহ্(সা.)-কে বলেন, সে কুরআন ভুল পড়ছে। মহানবী (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ! তুমি পড়ে শোনাও। তিনি যখন শুনালেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, সে তো ঠিকই পড়ছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল(সা.)! এই শব্দ তো আপনি আমাকে অন্যভাবে শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, সেটিও ঠিক আছে। এ থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর কাছে কেবল এই চার সাহাবীই পবিত্র কুরআন পড়তেন না বরং অন্যরাও পড়তেন। যেমন হযরত উমর (রা.)-এর এই উক্তি যে, আমাকে আপনি এভাবে পড়িয়েছেন স্পষ্ট করে, হযরত উমরও মহানবী (সা.)-এর কাছে পবিত্র কুরআন পড়তেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০,পৃ: ৪২৭-৪২৮)

হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র বা সদয় হলেন হযরত আবু বকর (রা.) আর আল্লাহর ধর্মে দৃঢ়তার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে হযরত উমর। তাদের মাঝে সবচেয়ে লজ্জাশীল হযরত উসমান এবং সবচেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত দানকারী হযরত আলী বিন আবি তালেব। তাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন উবাই বিন কা'ব এবং হালাল ও হারামের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি রাখেন হযরত মুআয বিন জাবাল এবং তাদের মাঝে অবশ্য কর্তব্য বিষয়ের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি রাখেন হযরত যায়েদ বিন সাবেত। তিনি (সা.) বলেন, শোন! প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন আমীন থাকে আর এই উম্মতের আমীন হলেন, হযরত আবু উবায়দা বিন জার্রাহ।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবু ইফতিতাহুল কিতাবু ফিল ঈমান)

প্রায় একইভাবে এই রেওয়ায়েত পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, মহানবী (সা.) বলেন, কতই না উত্তম ব্যক্তি আবু বকর, কতই না উত্তম ব্যক্তি উমর, কতই না উত্তম ব্যক্তি আবু উবায়দা বিন আল জার্রাহ, কতই না উত্তম ব্যক্তি উসায়েদ বিন হুযায়ের, কতই না উত্তম মানুষ সাবেত বিন কায়েস বিন শামাস, কতই না উত্তম ব্যক্তি মুআয বিন জাবাল আর কতই না উত্তম ব্যক্তি মুআয বিন আমর বিন জমুহ্, এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়েত।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০২)

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) একদিন তার হাত ধরে বলেন, হে মুআয! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি, হযরত মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত,

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! আমি তোমাকে তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এই যিকির করবে আর এটিকে তুমি কখনো পরিত্যাগ করবে না, অর্থাৎ তুমি বল, ***'আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরেকা ওয়া শুকরেকা ওয়া হুসনে ইবাদাতিকা'***। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমায় স্মরণ করা এবং তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর সুন্দরভাবে তোমার ইবাদতের বিষয়ে আমায় সাহায্য কর।

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৮০, হাদীস-২২৪৭০)

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের দ্বার সমূহের মধ্য থেকে একটি দ্বারের বিষয়ে অবগত করব না? এতে হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কেন নয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, ***'লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'*** পড়তে থাক।

(মুসনাদে আহমদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪, হাদীস-২২৪৫০)

হযরত মুআয (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, সর্বোত্তম ঈমান হলো- তুমি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে আর তুমি নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত রাখবে। হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আর কী কী? মহানবী (সা.) বলেন, মানুষের জন্য তুমি তা-ই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তাদের জন্য তুমি সেই জিনিস অপছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ কর।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৫, হাদীস-২২৪৮১)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) রেওয়ায়েত করেন, হযরত মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ার পর নিজ পাড়ার লোকদের মাঝে আসতেন এবং তাদের নামায পড়াতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭১১)

অর্থাৎ প্রথমে মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তেন, এরপর নিজ পাড়ায় ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকদের নামায পড়াতেন। এটি বুখারীর হাদীস। হযরত জাবের (রা.) বলেন, হযরত মুআয (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর সাথে নামায পড়তেন। এরপর এসে নিজ পড়ার লোকদের ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে এশার নামায পড়েন আর এরপর নিজের মহল্লায় ফিরে এসে তাদের ইমামতি করেন এবং এতে তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করেন। তখন এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং একা একা নামায পড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। (অর্থাৎ সে দেখে যে, দীর্ঘ সূরা পাঠ করা হচ্ছে, তাই সে সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং একা নামায পড়ে নেয়) তখন লোকজন তাকে বলে, হে অমুক! তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেছ? অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করে বলে, তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেছ যে, বাজামা'ত নামায ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে নামায পড়ছ? সে উত্তরে বলে, না, খোদার কসম, আমি মুনাফেক নই। আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আমি অবশ্যই তাঁকে জানাব যে, আমি এমনটি করেছি। কপটতা থাকলে তো আমি পালিয়ে যেতাম। আমি তো গিয়ে মহানবী (সা.)-কে একথা জানাব। অতএব সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা পানিবাহী উট পালন করি। অর্থাৎ উটের মাধ্যমে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পানি নিয়ে যাই এবং মানুষের বাড়ি বাড়ি পানি সরবরাহ করি। সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়। এদিকে হযরত মুআয (রা.) আপনার সাথে এশার নামায পড়ার পর ফিরে এসে সূরা বাকারা পড়া আরম্ভ করেছেন। আপনার সাথে নামায পড়ে তিনি আমাদের পাড়ায় এসে নামায পড়ান। অতএব মহানবী (সা.)হযরত মুআয (রা.)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুআয! তুমি কি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলছ? অর্থাৎ তুমি মানুষকে কেন সমস্যার মুখে ঠেলে দিচ্ছ? এগুলো পড়, অর্থাৎ এ সূরা গুলো পাঠ কর, এরপরতিনি (সা.) বলেন যে, কী পড়তে হবে। হযরত জাবের (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) বলেন, ওয়াশ্ শামসে ওয়া যুহাহা এবং ওয়ায্‌যুহা, ওয়াল্ লায়লে ইযা ইয়াগশা এবং সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা তিলাওয়াত কর। উদাহরণস্বরূপ তিনি (সা.) এ চারটি সূরার উল্লেখ করেন। এটি সহীহ্ মুসলিম-এর রেওয়ায়েত।

(সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৬৫)

বুখারী শরীফে একটি রেওয়ায়েত এভাবেও বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী বলতেন, সামনের দিক থেকে এক ব্যক্তি পানিবাহী দুটি উট নিয়ে আসছিল আর তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে হযরত মুআয (রা.) কে নামায পড়াতে দেখে। মসজিদে নামায হচ্ছিল আর তিনি ইমামতি করছিলেন। এটি দেখে সেই ব্যক্তি তার উট বসিয়ে দিয়ে হযরত মুআয (রা.) দিকে অগ্রসর হয় আর হযরত মুআয সূরা বাকারা অথবা সূরা নিসা পড়েন; তখন সে নামায ছেড়ে চলে যায়। পরে সে জানতে পারে, হযরত মুআয (রা.) এটি অপছন্দ করেছেন। তখন উটের মালিক সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে হযরত মুআয (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। একথা শুনে মহানবী (সা.) তিনবার বলেন, হে মুআয! তুমি তো মানুষকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দাও। এত দীর্ঘ দীর্ঘ সূরা পড়ে মানুষকে কেন পরীক্ষায় ফেল? তুমি কেন 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা, ওয়াশ্ শামসে ওয়া যুহাহা, ওয়াল্ লায়লে ইযা ইয়াগশা' পড় না? কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং অভাবীরাও নামায পড়ে। আমি যেমনটি বলেছি, এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭০৫)

হযতর খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নামাযে ছোট সূরা পড়া সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-কে উপদেশ প্রদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, মহানবী (সা.) সাধারণত ফরয নামাযে সূরা আল আ'লা, সূরা আল গাশিয়া, সূরা ফজর এবং এধরনের অন্য আরো কিছু সূরা পাঠ করা বেশি পছন্দ করতেন। নাসাঈ হযরত জাবের (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) একবার নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি পিছন থেকে এসে তার সাথে নামাযে যোগ দেয়। হযরত মুআয (রা.) নামায দীর্ঘ করতে থাকেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি সূরা আলে ইমরান বা সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করেন। নামায দীর্ঘ হয়ে গেলে সেই ব্যক্তি তার নামায ছেড়ে দিয়ে (মসজিদের) অন্য এক কোণে গিয়ে পৃথকভাবে নামায পড়ে চলে যায়। নামায শেষ হওয়ার পর কোন এক ব্যক্তি হযরত মুআয (রা.)-এর কাছে এ ঘটনার উল্লেখ করে বলে, আপনি নামায পড়াচ্ছিলেন আর তখন এক ব্যক্তি এসে আপনার সাথে নামায শুরু করে কিন্তু আপনি যখন নামায দীর্ঘ করেন তখন সে নামায ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং এক কোণে নামায পড়ে চলে যায়। একথা শুনে হযরত মুআয (রা.) বলেন, সে (কোন) মুনাফেক হবে। পরে তিনি [অর্থাৎ হযরত মুআয (রা.) স্বয়ং] মহানবী (সা.)-এর সমীপে এ ঘটনার উল্লেখ করেন। এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুআয (রা.) নিজে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নামায পড়াচ্ছিলাম আর অমুক ব্যক্তি এসে নামাযে শরীক হয়, কিন্তু নামায দীর্ঘ হয়ে গেলে সে নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা নামায পড়ে চলে যায়। সেই ব্যক্তি যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তখন সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যখন আসি তখন তিনি নামায পড়াচ্ছিলেন আর আমি তার সাথে নামাযে যোগ দিই, কিন্তু তিনি নামায দীর্ঘ করেন। আমরা শ্রমজীবি মানুষ, আমার উটনী অভুক্ত দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমি নামায ছেড়ে দিয়ে মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নিই আর বাড়ি গিয়ে আমার উটনীকে খাবার দিই। মহানবী (সা.) এসব কথা শুনে হযরত মুআয (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে বলেন, হে মুআয! তুমি কি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলছ? তোমার 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'ওয়াশ্‌শামসে ওয়া যুহাহা', 'ওয়াল্ ফাজরে' আর 'ওয়াল্ লায়লে ইযা ইয়াগশা' পড়তে কী অসুবিধা ছিল? তুমি কেন এই সূরাগুলো পড়লে না, কেন দীর্ঘ সূরা পড়া শুরু করলে? এথেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.) এই সূরাগুলোকে মাঝারি আকারের সূরা আখ্যা দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ দীর্ঘ সূরা পড়তে

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

পারে, কিংবা কষ্টকর পরিস্থিতি ও অসুস্থ তার সময় ছোট সূরা পড়তে পারে। কিন্তু মাঝারি আকারের সূরা সেগুলোই, যেগুলো শ্রুত তিলাওয়াত করার সময় নামাযে সাধারণত পড়া উচিত।

(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড,পৃ: ৪৭৯)

যাহোক, এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল এই সূরাগুলোই পড়তে হবে তা নয়। এটি হলো নীতিগত নির্দেশনা, অর্থাৎ বাজামা'ত নামাযে বেশি দীর্ঘ সূরা পড়বে না। কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে যার যেটি মুখস্ত থাকে অর্থাৎ কারো যদি কেবল ছোট সূরাই মুখস্ত থাকে আর ইমামতির জন্য অন্য কাউকে পাওয়া নাযায় এবং তাকেই নামায পড়াতে হয়, তখন সেগুলো দিয়েও পড়ানো যেতে পারে। তবে নীতিগত নির্দেশনা হলো, বাজামা'ত নামাযে দীর্ঘ সূরা পড়ানো উচিত নয়। কেননা (নামাযে) বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে- বৃদ্ধরাও থাকে, অসুস্থরাও থাকে এবং কর্মব্যস্ত মানুষও থাকে।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বলেন, আমি বাহনে মহানবী (সা.)-এর পিছনে বসে ছিলাম, আমার ও তাঁর (সা.) মাঝে উটের হাওদার পেছনের অংশটা ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আর এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং আবার বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি আবারও নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আর এটা আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) আরো কিছুক্ষণ অগ্রসর হন এবং এরপর বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আর এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জান, বান্দাদের কাছে আল্লাহ্‌র অধিকার বা প্রাপ্য কী? আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, বান্দাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য হলো- আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। এরপর তিনি (সা.) আবারও কিছুদূর যাত্রা অব্যাহত রাখার পর বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি উত্তরে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল(সা.)! আমি উপস্থিত, এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জান, আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাদের অধিকার বা প্রাপ্য কী?' [প্রথমে আল্লাহ্‌র অধিকারের কথা বলা হয়েছে যা বান্দাদের প্রদান করতে হবে আর এখন আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাদের অধিকার কী- তা বলছেন। অর্থাৎ বান্দা যখন নিজের দায়িত্ব পালন করবে, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করবে, তখনআল্লাহ্‌র কাছে বান্দার কী প্রাপ্য।] তখন আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, বান্দাদের শাস্তি না দেয়। যারা এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কথা মান্যকারী হয় সেই বান্দাদের অধিকার হলো, আল্লাহ্ তা'লার তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া। এটি সহীহ্ মুসলিমের হাদীস।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-৩০)

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, এক সফরে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। একদিন আমি তাঁর নিকটে যাই এবং আমরা দু'জন (পাশাপাশি) হাঁটছিলাম। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এমন কোন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং আমাকে আগুন থেকে দূরে নিয়ে যাবে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি অনেক বড় একটি কথা জিজ্ঞেস করেছ! (এটি অনেক বড় বিষয়) তবে এটি সেই ব্যক্তির জন্য সহজ যার জন্য মহান আল্লাহ্ সহজ করে দেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, রমজানের রোযা রাখ এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ পালন কর। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বলেন রোযা হলো ঢাল(স্বরূপ) এবং সদকা পাপসমূহকে সেভাবে মোচন করে যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এছাড়া রাতে উঠে নামায পড়া [অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া]। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক হয়ে যায় যখন তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের প্রভুকে আহ্বান করে।আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দান করেছি, তারা তা থেকে খরচ করে। অতএব কোন প্রাণী জানে না যে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ নয়নের স্নিগ্ধতা (প্রদানকারী পুরস্কাররাজি) থেকে কতকিছু গোপন করে রাখা হয়েছে।

(সূরা সাজদা: ১৭)

অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের এসবের উন্নত চূড়া এবং এর স্তম্ভ আর এর ওপরের অংশ সম্পর্কে অবহিত করব কি? তিনি বলেন, তা হলো জিহাদ। অতঃপর বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা অবহিত করব না যার ওপর এই সব কিছুর ভিত্তি? অর্থাৎ সেই মূল জিনিস যার চারপাশে এই সবকিছু প্রদক্ষিণ করে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অবশ্যই বলুন। তখন মহানবী (সা.) নিজের জিহ্বাকে ধরে বলেন, এটিকে নিয়ন্ত্রণে রেখো। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আমরা এর মাধ্যমে যা বলি তার জন্য কি জিজ্ঞাসিত হব? তিনি (সা.) বলেন, তোমার কল্যাণ হোক, হে মুআয! মানুষকে তাদের জিহ্বা দ্বারা কর্তিত ফসলই লাঞ্ছিত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করে।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবু ফিতান, হাদীস-৩৯৭৩)

অর্থাৎ তোমরা জিহ্বা দ্বারা যেসব কথা বল, ধারালো যেসব কথা বল, কথার মাধ্যমে দেওয়া আঘাত এমন যে, তা আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হানে, তা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং আরো বহু মন্দ তা থেকে উদ্ভূত হয়। অতএব এসব জিনিস, অর্থাৎ মুখ থেকে যখন মন্দ কথা বের হয় বা মুখ থেকে নিঃসৃত কথা যখন পাপের মাধ্যম হয়, তখন তা তাদেরকে লাঞ্ছিত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপকারী হয়ে থাকে। তাই জিহ্বাকে সতর্কতার সাথে ব্যবহার কর এবং এর মাধ্যমে যেন ভালো ভালো কথা বলা হয়।

হযরত কা'ব বিন মালেক বলতেন, হযরত মুআয বিন জাবাল মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে মদিনায় ধর্মীয় ফতোয়া প্রদান করতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ:২৬৫)

মুহাম্মদ বিন সাহাল বিন আবু খায়সামা নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে মুহাজেরদের মধ্য থেকে তিনজন এবং আনসারদের তিনজন ফতোয়া প্রদান করতেন, তারা ছিলেন- হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত মুআয বিন জাবাল এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৭)

আব্দুর রহমান বিন কাসেম নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন কোন বিষয়ে সুমত পোষণকারী ও ফিকাহবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইতেন, তখন তিনি মুহাজের ও আনসারদের ডাকতেন। অর্থাৎ হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে ডাকতেন। তারা সবাই হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে ফতোয়া প্রদান করতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ:২৬৭)

অর্থাৎ তারা ইফতা কমিটির সদস্য ছিলেন অথবা তাদেরকে তিনি এই অধিকার প্রদান করেছিলেন যে, তারা নিজেদের সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে ফতোয়া দিতে পারতেন যা তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন।

হযরত মুআয বিন জাবাল হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। হযরত মুআয বিন জাবাল যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তার মদিনা পরিত্যাগ করা মদিনাবাসীকে ফিকাহ্ এবং যেসব বিষয়ে তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন সেসব ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, মানুষের তাকে প্রয়োজন, তাকে যেতে বারণ করুন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এ বলে অস্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি সংকল্প বেঁধেছে এবং যে শাহাদাতের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আকাঙ্ক্ষী, আমি তাকে বাধা দিতে পারি না। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, খোদার কসম, মানুষকে তার বিছানায়ও শাহাদত দান করা হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

সওর বিন ইয়াযিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআয বিন জাবাল যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন তখন এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! চোখ নিদ্রিত আর তারকারাজি মিটমিট করছে। তুমি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। হে আল্লাহ! জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় এই অধম দুর্বল, আগুন থেকে পলায়নের ক্ষেত্রে আমি বল ও শক্তিহীন। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার জন্য হেদায়েত রেখে দাও, যা কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে দিবে। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।

(উসদুলগাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা,৫ম খণ্ড,পৃ:১৮৮)

কতইনা ভয় ও ভীতির অবস্থা এটি!

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর পিছনে গদিতে হযরত মুআয আরোহিত ছিলেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) এভাবে তিনবার ডাকার পর বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আগুনে যাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ করে দিবেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমি কি মানুষকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিব না? তারা আনন্দিত হবে, অর্থাৎ মানুষ কে এই কথা অবহিত করব কি? তিনি (সা.) বলেন, তাহলে যে তারা এতেই নির্ভর করে বসে যাবে, এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর অন্যান্য পুণ্যকর্ম করবে না, তাই মানুষকে এটি বলবে না। হযরত মুআয (রা.) মৃত্যুর সময় পাপ এড়ানোর ভয়ে এই কথাটি জানিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কথা অন্যদের অবহিত করেন নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-১২৮)

এই মর্মে তার চিন্তা হয় (আর তিনি ভাবেন যে,) মৃত্যুর সময় এই কথা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে আমার পৌঁছে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, এরপরই তিনি তা বলেন। কিন্তু সারা জীবনে বা সুস্থ অবস্থায় তিনি এ কথা বলেননি। হযরত ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে উক্ত হাদীস সম্পর্কে বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেন, এখানে যে কথা বলা হয়েছে তাহলো, জ্ঞানগর্ভ বিশেষ কোন কথা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন; এটি যেহেতু জ্ঞানের বিষয় তাই এটিকে বিশেষ শ্রেণির মাঝেই সীমাবদ্ধ করতে হবে, কেননা সাধারণ জনগণ এর সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ নিছক এই কথা বলে দেওয়া এবং অন্য কোন আমল না করা। এই কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমা বলাই যথেষ্ট আর কোন আমলের প্রয়োজন নেই- এমন যেন না হয়। বর্তমানে এতদসত্ত্বেও কার্যত মুসলমানদের অবস্থা এমনই। তারা নিছক নামসর্বস্ব মুসলমান; কলেমা পড়ে তারা মনে করে যে, কর্মের কোন প্রয়োজন নেই।

তারপর হযরত শাহ সাহেব লিখেন, এ হাদীসটি এরূপ বিষয়াদির ধরন স্পষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করছিলেন এবং এই হাদীসটিও সেসবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর তিনি লিখেন, ইমাম মুসলিমও হযরত ইবনে মাসউদের একটি রেওয়ায়েত সঠিক সনদ থেকে বর্ণনা করেন; যেখানে এই শব্দাবলী রয়েছে যে - ***'মা আনতা বেমুহাদ্দেসিন কুওমান হাদীসান লা ইয়াবলুগুহু উকূলুহুম ইল্লা কানা লেবা'যিহিম ফিতনা।'*** মহানবী (সা.)-এর এই কথার মর্মার্থ হলো- মানুষ কে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তি অনুযায়ী সম্বোধন করা উচিত; কেননা কোন কোন কথা পরীক্ষায় নিপতিত করে। অতঃপর তিনি লিখেন, আমরা এখনও লক্ষ্য করি যে, যারা মু'মিন হওয়ার ফতোয়া বিতরণ করে এমন লোকেরা কীভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ কলেমা'র নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে এবং মানবজাতিকে শরীয়তের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে তাদেরকে ঈমানের সনদ প্রদান করতে চায়। আর 'সিদকাম্ মিন কালবে' অর্থাৎ এর অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির প্রতি সামান্যতম দৃষ্টি দেয় না। প্রত্যেক মৌলভী, মিম্বরে উঠে খুতবা প্রদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে যে, আমার পিছনে যে ব্যক্তি নামায পড়ছে সে কলেমা পড়ে নিলেই সার্টিফিকেট পেয়ে গেল, বাকি আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি লিখেন, মৌখিকভাবে স্বীকৃতিপ্রদানকারী এসব মু'মিন থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, তখন অন্তরেও ঈমান থাকবে না এবং মুখেও নয়, বরং তা থাকবে সুরাইয়া নক্ষত্রে। অর্থাৎ এখানে তিনি আখেরী জামানার কথা বলেছেন (আর তখন বলেছেন) যখন কিনা তারা (অর্থাৎ সাহাবীরা) উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি মহানবী (সা.) কলেমা পড়ার কথাটিও বলেছিলেন। অতঃপর তিনি লিখেন, ***'মান লাকেয়াল্লাহা লা ইয়ুশরিকু বিহি শায়আ।'*** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমৃত্যু সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে চলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহানবী (সা.)-এর হযরত মুআয (রা.)-কে ২/৩ বার সম্বোধন করে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া এবং এরপর একথা বলা যে নীতির অধীনে ছিল তা হলো, তিনি (সা.) তার জানার আগ্রহ এবং বাসনাকে জাগ্রত করেছেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) যখন ২/৩ বার ডাকেন তখন সেই সাহাবী বলেন, লাব্বায়েক, জ্বি, আমি উপস্থিত রয়েছি। এভাবে তার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয় (তা জানার জন্য, যা) মহানবী (সা.) বলতে চাইছেন। যখন পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তখন তিনি (সা.) তাকে উক্ত কথা বলেন। অতঃপর শাহ সাহেব লিখেন, এমনটি করার উদ্দেশ্য হলো, কথা যেন ভালোভাবে মস্তিষ্কে গেঁথে যায় এবং এর প্রভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ বিষয়টিকে মনে গেঁথে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মহানবী (সা.) তিনবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হযরত মুআয (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর উক্ত আদেশের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তা অবহিত করেন, যেন এমন না হয় যে, একটি অতি জরুরী বিষয় না বলার কারণে তাকে জবাবদিহি করা হবে।

(সহী বুখারীর অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১১-২১২)

এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, তুমি একটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও তা আর কাউকে বলনি। অর্থাৎ জ্ঞানের কথা কমপক্ষে জ্ঞানী লোকদের কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত।

এমনিতে তো বর্তমানে মুসলমানরা ঈমানের দাবি করে থাকে এবং কলেমা পড়েই মনে করে যে, শিরক থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছে। অথচ তাদের হৃদয় শিরকে পরিপূর্ণ, জাগতিক উপায়-উপকরণের উপরই তাদের ভরসা। তাদের আসল চিত্র যদি উদঘাটন করা হয়, তাহলে দেখা যায় বড় বড় খতিবরাও জাগতিক উপায় উপকরণের ওপরই নির্ভর করে। পূর্বে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কলেমা পাঠকারীদের জন্য আগুন হারাম হওয়ার যে উল্লেখ হয়েছে, তা থেকে এটিও স্পষ্ট হয় যে, এই প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা দিবেন। এটি কোন মানুষের কাজ নয় যে, কোন কলেমা পাঠকারীর উপর ফতোয়া আরোপ করবে যে এ ব্যক্তি মুসলমান আর এ ব্যক্তি মুসলমান নয়? তাদের মনগড়া এসব ফতোয়া প্রদান কুরআনের শিক্ষারও বিরোধী। বর্তমানে মুসলমানরা রবিউল আউয়াল মাসের প্রেক্ষিতে ঘটা করে যে মিলাদুন্ নবী দিবস পালন করছে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয় হলো মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং আদর্শকে অবলম্বন করা। জ্ঞানের বড়াই করে কেবল নিজেদেরই মুসলমান মনে করবেন না, বরং কলেমা পাঠকারীদের বিষয় আল্লাহ্ তা'লার ওপর ছেড়ে দিন। এই বিষয়গুলোই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আত্মার জন্য আনন্দের কারণ হবে। তাঁর (সা.) উম্মতের পক্ষ থেকে আনন্দের কারণ হবে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পাশাপাশি খোদা তা'লার প্রতি এ কারণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন যে, তিনি তাঁর (সা.) ধর্মকে এতীমের মতো ছেড়ে দেন নি, বরং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যার কাজ হলো কলেমা এবং শরীয়তের বিধিনিষেধের ওপর আমল করার প্রকৃত তাৎপর্য আমাদেরকে অবহিত করা, যাতে সত্যিকারার্থে জাহান্নামের আগুন আমাদের জন্য হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

(আ.)-এর অমান্যকারীদেরও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যেন তারাও এ কথা বুঝতে পারে। পাশাপাশি তিনি আমাদেরকেও প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এবং কলেমার মর্ম বুঝার ও তার উপর আমল করার সামর্থ্য প্রদান করুন।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা তাবুকের যুদ্ধের বছর মহানবী (সা.)-এর সাথে বের হই। তিনি (সা.) নামায জমা করতেন। তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করতেন। একদিন তিনি (সা.) নামায পড়াতে কিছুটা বিলম্ব করেন। তিনি (সা.) বাহিরে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায জমা করেন। তারপর তিনি ভিতরে চলে যান। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। নামায জমা করার অর্থ এই নয় যে, চার ওয়াক্তের নামায একই সাথে আদায় করতেন বরং নামায গুলোর অন্তবর্তী ব্যবধান কম হতো। হতে পারে যে, যোহরের নামায আসরের শেষ সময়ে আসরের নামাযের সাথে জমা করা হতো এবং মাগরিব ও এশার নামায মাগরিবের সময় হতেই পড়া হতো। তিনি বলেন অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, আগামীকাল তোমরা তাবুকের ঝর্ণাধারার নিকটে পৌঁছবে, ইনশাআল্লাহ্। যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো ভালোভাবে দেখা না যাবে তোমরা সেখানে পৌঁছাতে পারবে না, অর্থাৎ তোমরা দিনের বেলায় সেখানে পৌঁছবে আর এটি তিনি (সা.) অনুমান করে বলেছিলেন। [তিনি (সা.) বলেন] তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই সেই ঝরনার নিকট পৌঁছবে, আমি না আসা পর্যন্ত সেটির পানি যেন কেউ আদৌ স্পর্শ না করে। অর্থাৎ সেখানে পৌছে তোমরা পানি পান করবে না এবং হাত লাগাবে না যতক্ষন পর্যন্ত না আমি সেখানে পৌঁছি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা সেখানে পৌঁছি, কিন্তু আমাদের আগেই সেখানে দুই ব্যক্তি পৌঁছে গিয়েছিল আর ঝরনায় প্রবহমান পানি ফিতার ন্যায় শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল অর্থাৎ খুবই সামান্য মাত্রায় পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কি এর পানি স্পর্শ করেছ বা পানি পান করনি তো? তারা বলে হ্যাঁ আমরা সেখান থেকে পানি তুলে পান করেছি। অতপর মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ধমক দিয়ে বলেন, আমি তো তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, কেন তোমরা এটিতে স্পর্শ করেছো? আল্লাহ্ তা'লা যা চেয়েছেন তিনি (সা.) তাদেরকে বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা সেই ঝরনা থেকে নিজেদের হাত দ্বারা অল্প অল্প করে কিছু পানি বের করেন। আর এভাবেই একটি পাত্রে কিছু পানি জমা হয়। সত্যিকার অর্থে খুবই ক্ষীণ জলধারা বইছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) পাত্রের মধ্যে দুই হাত ধৌত করেন এবং মুখও ধৌত করেন। অতঃপর সেই পানি পুনরায় ঝরনার মধ্যে ঢেলে দেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) সেই ঝরনার পাশে বসে মুখ ধৌত করেন আর সেই পানি গড়িয়ে ঝরনার মধ্যে পড়ছিল, তখন ঝরনা দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন মুখ ও হাত ধৌত করেন এবং সেখানে পানি ঢেলে দেন তখন প্রথমে যে ঝরনা অত্যন্ত শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, তা দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকে আর লোকজন তৃপ্তি সহকারে পান করতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, হে মুআয তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, এই জায়গা বাগানে ভরে গেছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, হাদীস-৭০৬)

হাদীসের গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, এই মো'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শন সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মহানবী (সা.) কেবল তবুক প্রান্তরে পৌঁছেছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে যে, এই ঘটনা তবুক প্রান্তর থেকে ফিরে আসার সময় মুশাক্কাক নামক একটি উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮২১-৮২২)

এই ঘটনাটি হযরত ইমাম মালেক তার হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা'তেও বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানি এই হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আবু ওয়ালিদ বাজী বলেন, এটি অদৃশ্যের সংবাদ যা পূর্ণতা লাভ করেছে। মহানবী (সা.) বিশেষভাবে হযরত মুআযের উল্লেখ এজন্য করেন কেননা তাঁর সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার ছিল এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি (সা.) ওহীর মাধ্যমের জানতে পারেন যে, হযরত মুআয এই জায়গা দেখতে পাবেন এবং সেই উপত্যকা তাঁর (সা.) বরকতে বৃক্ষরাজি ও উদ্যান সম্ভারে পরিণত হবে।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্‌র বর্ণনা করেন, ইবনে ওয়াসা বলেন যে, আমি সেই ঝরনার চতুষ্পার্শ্বের জায়গা দেখেছি, সেখানে গাছপালার সবুজ শ্যামলতা এত পরিমাণে ছিল যে, দেখে মনে হয় এই শ্যামলতা হয়ত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আর তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীও এমনই ছিল।

(শারাহুয যুরকানি আলাল মোতা, ১ম ভাগ, পৃ: ৪৩৬)

'এটলাস সীরাতুন্নবী (সা.)' পুস্তকে লিখা আছে যে, তবুকের শরিয়াহ্ মহকুমার প্রধান বলেন, এই ঝরনা দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত পৌনে চৌদ্দ শত বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে চির শ্যামল হয়ে ছিল। পরবর্তী সময়ে নীচু এলাকা গুলোতে যখন টিউবওয়েল বসানো হয় তখন এই ঝরনার পানি টিউবওয়েল গুলোর দিকে নেমে যায়। কমপক্ষে পঁচিশটি টিউবওয়েলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এই ঝরনাটি বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। এরপর তিনি আমাদেরকে একটি টিউবওয়েলের দিকেও নিয়ে যান। আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে চার ইঞ্চির একটি পাইপ লাগানো আছে আর কোন মেশিন ছাড়াই সেটি থেকে প্রবল বেগে পানি নির্গত হচ্ছে, আর আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, পার্শ্ববর্তী অপরাপর টিউবওয়েলগুলোর অবস্থাও প্রায় এমনই। এটি মূলত মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক নিদর্শনের কল্যাণ, আজ তবুকে এত অধিক পরিমাণ পানি মজুদ রয়েছে, মদিনা আর খায়বার ব্যতীত অন্য কোথাও এত পরিমাণ পানি আমরা দেখি নি। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, তবুকের পানি এ উভয় স্থানের তুলনায় অধিক, সেই পানি ব্যবহার করে এখন তবুকের সর্বত্র বাগান করা হচ্ছে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাবুক অঞ্চল বাগানে পরিপূর্ণ আর প্রতিনিয়ত তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

(এটলাস সীরাতে নববী, পৃ: ৪৩১)

তাঁর (রা.) সীরাত বিষয়ক বাকি আলোচনা পরে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি ঐ সকল প্রয়াত ব্যক্তিদের উল্লেখ করছি, জুমুআর নামাযের পর আমি যাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।প্রথম স্মৃতিচারণ হবে, মৌলভী ফারযান খান সাহেবের, যিনি উড়িষ্যার খুরুদ্দা এবং নয়াগড় এর মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ডায়াবেটিস এর রোগী ছিলেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর হঠাৎ টাইফয়েড এবং প্রচণ্ড নিউমোনিয়ার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আর সেখানেই ঐশী সিদ্ধান্তের অধীনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে তার স্ত্রী সাকিনা বেগম ছাড়াও এক মেয়ে ফারিহা এবং ছেলে স্নেহের রায়হান সাহেব রয়েছেন। জামা'তের কাজে তিনি খুবই অগ্রসর ছিলেন। পরহেযগার, পুণ্যবান এবং অধীনস্ত মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিম সাহেবদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। বিনম্র স্বভাব, সচ্চরিত্রবান, অত্যন্ত পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯৮০ সনে তিনি কাদিয়ান জামেয়ায় ভর্তি হন এবং ১৮৮৮ সালে পাশ করে বের হওয়ার পর কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। খুবই পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং ওয়াকফের প্রেরণার সাথে ৩২ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সময়কালে তিনি বহু জায়গায় বয়আত করিয়েছেন এবং জামা'তও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার স্ত্রী সাকিনা বেগম সাহেবা বলেন, মৌলভী সাহেব বলতেন, তার প্রথম পোস্টিং হয় হারিয়ানায়। সেখানে নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না এবং উক্ত এলাকায় কোন আহমদীও ছিল না। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করতেন এবং তবলীগ করতেন আর সেন্টার বা পকেট বানাতেন। সেখানে থাকা অবস্থায় একবার একটি গ্রামে যান এবং গ্রামের লোকদের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছান। একদা সেখানকার এক স্থানীয় ব্যক্তি বলে, আমাদের মহিষ দুধ দেয় না, আপনার জামা'ত যদি সত্য হয় তাহলে আপনি পানিতে দম করে আমাকে দিন। আমি মহিষকে তা থেকে পান করাব যেন সেই মহিষ দুধ দেয়। আপনার পক্ষ থেকে যদি এই অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয় তাহলে আমরা অর্থাৎ পুরো পরিবার বয়আত করব। মৌলভী সাহেব বলেন, আমি সূরা ফাতিহা ও দরুদ শরীফ পাঠ করি এবং কিছু দোয়া পড়ে পানিতে দম করে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিই। সেই ব্যক্তি পানি নিয়ে চলে যায়। আমি সেই গ্রামে সারারাত অবস্থান করি। মৌলভী সাহেব বলেন, গ্রামে একটি বড় গাছ ছিল, সেই গাছের নীচে আমি সারারাত বসে ছিলাম এবং এ দোয়া করতে থাকি যে, হে আল্লাহ্! তুমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করে দেখাও। মৌলভী সাহেব বলেন, সকাল হতেই দেখি এক ব্যক্তি বালতি নিয়ে আসছে এবং বালতিতে দুধ ছিল। সেই ব্যক্তি বলে মৌলভী সাহেব! আমাদের মহিষ দুধ

দিয়েছে। আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে সে বলে, আমি ও আমার পরিবার বুঝে গেছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সত্য। তাই আমরা পুরো পরিবার সানন্দে বয়আত করছি।

তার ছেলে রায়হান বলেন, আমার পিতার মাঝে নম্রতা ও বিনয় ছিল সীমাহীন। অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে ভালোবাসার আচরণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং জামা'তের সেবার উদ্দেশ্যেই নিজ জীবন অতিবাহিত করেছেন। যুগ খলীফার প্রতিটি আদেশ ও দিক-নির্দেশনায় সাড়া দিতেন আর আমাদেরও একই উপদেশ দিতেন। আমাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ও ভালোবাসার আচরণ করতেন। জামা'তের কাজের পাশাপাশি ঘরের কাজেও অংশ নিতেন আর মাকে সাহায্য করতেন। সারা জীবন নিজের নামাযেরও সুরক্ষা করেছেন আর আমাদের নামাযেরও সুরক্ষা করিয়েছেন। আমাদেরকে সর্বদা সরল-সঠিক পথে চলার উপদেশ দিতেন। তার সাথে যতজন মুয়াল্লেম ও মুরব্বী সাহেব কাজ করতেন, তারা সবাই লিখেছেন যে, তিনি একজন আদর্শস্থানীয় মুবাল্লেগ ছিলেন এবং সুহৃদ ছিলেন আর আমরা তাকে কখনো রাগান্বিত হতে দেখি নি।

পরবর্তী জানাযা হলো আব্দুল্লাহ্ মুসিকো সাহেবের, যিনি মালয়েশিয়ার স্থানীয় মিশনারী ছিলেন। গত ৭ অক্টোবর তারিখে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়, কিন্তু আরোগ্য লাভ হয় নি এবং ঐ রাতেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও তিনি আটজন সন্তান রেখে গেছেন। মালয়েশিয়ার দুজন মুরব্বী সালাহ্উদ্দীন সাহেব ও মসরূর আহমদ সাহেবের শ্বশুর ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ মুসিকো সাহেব ফিলিপাইনে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করার পর মুসলিম সংগঠন মোরু ন্যাশনাল লিবারেল ফ্রন্টে যোগদান করেন। এই সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল ফিলিপাইনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭৩ সনে তার পিতামাতা হিজরত করে ফিলিপাইন থেকে মালয়েশিয়া চলে আসেন এবং সুন্দাকুন সুবা তে বসবাস শুরু করেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুণ্যাত্মা দিয়েছিলেন। কয়েকবার তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফাতুল মসীহ্ সানী এবং খলীফাতুল মসীহ্ সালেসকে স্বপ্নে দেখেন। খোদার ইচ্ছায় ১৯৭৩ সনে তিনি তাকিনা বালুর জলসা সালানায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান। সেখানে জলসার সব কার্যক্রম তার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় এবং তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। সুন্দাকুন-এ তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে কোন মুবাল্লেগ ছিল না, আর তিনি ছিলেন এক তৃষ্ণার্ত আত্মা। সুতরাং সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি জামা'তের পুস্তকাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তবলীগের খুব আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহকে তিনি বাস্তব রূপ দেন আর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ এলাকায় অনেক তবলীগ করেন। এর ফলে বহু লোক আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তার তবলীগের আগ্রহের কারণে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। একইভাবে তিনি কয়েক বছর ফিলিপাইনে খায়রুদ্দীন বারুস সাহেবের সাথেও কাজ করার সুযোগ পান। তার পবিত্র স্বভাব, শিক্ষানুরাগ, বিনয়, দ্বীনতা ও খোদাভীতির কারণেতিনি সেখানেও অনেক কাজ করেন এবং খ্রিষ্টানদের সাথেও ধর্মীয় বিতর্ক করতেন আর বেশ কয়েকজনকে ইসলামের ক্রোড়ে নিয়ে আসেন। উর্দূ বলতে পারতেন না, কিন্তু শেখার আগ্রহ ছিল। বেশকিছু উদ্ধৃতি মুখস্ত ছিল, নযম মুখস্ত ছিল। অতিথি পরায়ণতার খুব আগ্রহ ছিল। বিশেষভাবে জুমুআতে আগতদের আতিথেয়তা করতেন।সুশৃঙ্খল মানুষ ছিলেন। তিনি চাইতেন, প্রত্যেকে যেন সুশৃঙ্খল থাকে এবং তদনুযায়ী তরবিয়ত করতেন। কয়েক বছর যাবত চলাফেরার সমস্যা ছিল,কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো নিজের এ কষ্টকে নিজের কাজে বাধ সাধতে দেন নি।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

তৃতীয় জানাযা কাদিয়ানের মুয়াল্লেম সিলসিলা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের, যিনি ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । তিনি এক খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার বংশে সর্বপ্রথম বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন তার বড় ভাই, যিনি অবসরপ্রাপ্ত মুয়াল্লেম ছিলেন। এরপর পুরো পরিবার বয়আত করে। আহমদীয়াত গ্রহণের পর মরহুম জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন-এ ত্রিবর্ষীয় কোর্স করেন। সেখান থেকে পাশ করে বিভিন্ন এলাকায় তবলীগের ভালো দক্ষতা রাখতেন। তার মাধ্যমে কাদিয়ানের তিনটি খ্রিষ্টান ও তিনটি অ-আহমদী পরিবার জামা'তের অন্তর্ভু ক্ত হয়। তাদের মধ্য থেকেও দুই ব্যক্তি আল্লাহ্র ফযলে ওসীয়্যতকারী। অর্থাৎ শুধু অন্তর্ভুক্তই হন নি , বরং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামীও হয়েছেন। তার পরিবারে তিনি একজন পুত্র ও দুইজন কন্যা রেখে গেছেন। তার পুত্র এ বছর জামেয়া পাশ করে মুরব্বী হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা সব মরহুমদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। আল্লাহ্তা'লা তাদের সন্তানদেরকে তাদের পুণ্যকর্ম ধরে রাখার সামর্থ্য দিন। আল্লাহ্ তা'লা করুন তাদের ইচ্ছানুসারে যেন তাদের সন্তানদের তরবিয়ত হয়। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সন্তান ওয়াকফে জিন্দেগী রয়েছে, তারা খিলাফতের সত্যিকার সুলতান (তথা সাহায্যকারী) হোক। আমি যেমনটি বলেছি, জুমুআর নামাযের পর আমি তাদের জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

****

১ম পাতার শেষাংশ.....

অসন্তুষ্টিকেও ভয় পায়, তাকে চটে যাওয়ার সুযোগ দেয় না, তবে একজন মোমেন রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস '***ইন্না আবগায়ুল হালালু ইন্দাল্লাহিত তালাক'*** পড়ার বা শোনার পর কিভাবে অনায়াসে এর বিরুদ্ধাচরণ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? শরীয়ত যখন নির্দেশ দিচ্ছে যে তোমরা নিকৃষ্টতম হালাল বিষয়টি থেকে বিরত থাক, তখন প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য হল এমন বিষয়ের প্রয়োগ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা আর একথাটি দাম্পত্য বিবাদের সময় ভুলে না যাওয়া।

স্পষ্টতই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করবে যে তাকে সিরাতে মুস্তাকিম বা সহজ পথ দেখানো হোক, তার মস্তিষ্ক নিজেই এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হবে আর তার নিজের সমস্ত কাজে এমন উপায়ের সন্ধানেই তার চেষ্টাও নিয়োজিত হবে আর যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজে এই নীতিগুলি অনুসরণ করবে তার উচ্চাকাঙ্খা, কর্মের নিখুঁত হওয়া এবং পরিশ্রমের ধারাবাহিকতায় কি সন্দেহ থাকতে পারে? নীতিগুলি হল ১) আমার সমস্ত কাজ বৈধ উপায়ে সম্পন্ন হবে। ২) আমি কোনও পর্যায়ে উপনীত হয়ে তুষ্ট হয়ে যাব না, বরং আমার মনে যেন অসীম উন্নতির বাসনা লালিত হয়। ৩) আমার সময় অপচয় যেন না হয়, বরং এমনভাবে কাজ করি যাতে কম সময়ে সব কাজ পুরো করে ফেলি।

আমি মনে করি, মুসলমানেরা যদি এই দোয়াটি নিষ্ঠাসহকারে যাচনা করতে থাকে আর এর অর্থ মাথায় গেঁথে নেয় তবে দোয়ার ফলে যে উপকার হবে তার কথা উল্লেখ না-ই করলাম, মুসলমানদের মস্তিষ্কে এর যে স্বাভাবিক প্রভাব পড়বে সেটিও কম মূল্যবান নয়।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩)

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২০ বাতিল করা হয়েছে

জামাতের সমস্ত পদাধিকারী এবং সদস্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ২০২০ সালে কাদিয়ানে সালানা জলসা যা ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল, দেশে বর্তমান কোরোনা পরিস্থিতি, যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যান্য বিধিনিষেধকে দৃষ্টিপটে রেখে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

এরপর ১১ ও ১২ পাতায়

কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সঙ্গে হুযুর আনোর (আই.)-এর সাক্ষাত

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত স্টুডেন্ট এশোসিয়েশন এ নিয়মিত ছাত্রদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৭০ শতাংশ ছাত্রের তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে, যাদের সংখ্যা ৩৬৯।

এরপর অনুষ্ঠানসূচী অনুসারে দুই জন ছাত্র তাদের গবেষণাপত্র পাঠ করে শোনায়।

প্রথমে মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নাদির আহমদ সিন্ধু হৃদরোগ সম্পর্কে নিজের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি কার্ডিওলোজির ক্ষেত্রে গবেষণা করেছেন।

হৃদরোগের ক্ষেত্রে এমন দুটি প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে রোগের সূত্রপাতে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রোটিনদুটির নাম হল- MIFএবং SDF-1a

এই প্রোটিনদুটি বিভিন্ন রক্তকোষের আদানপ্রদানকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তের একটি উপাদান হল লোহিত রক্তকণিকা যা মানবদেহে অক্সিজেন বহন করে। এর সংখ্যা হ্রাস পেলে এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এর থেকে আকারে ক্ষুদ্র হল রক্ত লসিকা বা প্লেটলেটস। এর কাজ হল রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করা। শরীরে কোথাও কেটে গেলে বা কোনও স্থানে ক্ষত দেখা দিলে রক্তলসিকা তঞ্চিত হয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। এছাড়াও আরেকটি উপাদন হল মোনোসাইটস বা শ্বেতরক্তকণিকা। শরীরে কোনও জীবাণুর প্রবেশ ঘটলে বা কোনও কোষ নষ্ট হয়ে গেলে এটি সক্রিয় ওঠে আর জীবাণুকে ধ্বংস করে রক্তকে দুষণমুক্ত রাখে। এই সব কোষগুলির পারস্পরিক আদানপ্রদান বজায় রাখতে বিভিন্ন প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে যেগুলির মধ্যে MIFএবং SDF-1a অন্যতম।

পাশ্চাত্যের দেশসমূহে সব থেকে বেশি মৃত্যু হয় হৃদরোগে। তাদের শরীরে শিরায় শিরায় মেদ জমে সেগুলি নষ্ট হতে শুরু করে এবং ক্রমশ সেগুলিতে রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। এগুলি যদি হৃদপিণ্ডের শিরা হয়, তবে হার্ট এটাকের সম্ভাবনা তৈরী হয় আর যদি মস্তিষ্কের শিরা হয়, তবে পক্ষাঘাত হতে পারে। এখন বিষয়টি ধাপে ধাপে বোঝার চেষ্টা করব। যদি কোনও শিরার প্রাচীরের কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়,তবে তার মধ্যে চলমান রক্তলসিকা সেখানে তঞ্চিত হতে থাকে। রক্তনালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিভিন্ন কারণসমূহের মধ্যে একটি হল এর মধ্যে মেদ সঞ্চিত হওয়া যা সুগার এবং ধুমপানের কারণে হয়ে থাকে। রক্তলসিকা ক্ষতিগ্রস্ত শিরার প্রাচীরের কাছে জমে সেই পরিবহন পথটিকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে থাকা একাধিক প্রোটিন কোষ মুক্ত করে দেয় যা আগে থেকে সঞ্চিত থাকে।

এই প্রক্রিয়ায় শ্বেতকণিকাগুলি আমাদের লসিকার দিকে গতি পরিবর্তন করে এবং স্থানান্তর শুরু হয়ে যায়। এরফলে সব কিছু রক্ত ধমনী বা শিরার ভিতরে চলে যায়। আর সেই সময় শ্বেতকণিকাগুলি ম্যাক্রোফেজে রূপান্তরিত হয়। আর লসিকাগুলি আরও মেদ শোষণ করে ফোম সেলে পরিণত হয় যা নিজের মধ্যে মেদ সঞ্চয় করে নেয়। আর যতবেশি মেদ জমবে এগুলি আকারেও তত বড় হবে। আর রক্তনালিকাগুলিকে আরও বেশি সংকুচিত করবে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াটিতে সব থেকে বেশি ক্ষতির দিকটি হল রক্ত সংবহন প্রভাবিত হওয়া।

আমাদের গবেষণার দিকটি হল আমরা কি রক্তের এই সংবহনের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি প্রতিহত করতে সক্ষম, যা প্লাক রূপে হৃদরোগের কারণ হচ্ছে? এর জন্য দুটি উপায় আছে। লসিকা থেকে প্রোটিন নিঃসৃত হতেই কোনও ওষুধ প্রয়োগ করে তা নষ্ট করে দেওয়া কিম্বা শ্বেতরক্তকণিকায় থাকা এর রেসেপটরসগুলিকে অকেজো করে দেওয়া। এই দুটি উপায়কে আমরা এন্টিবডি প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেছি। এর যে পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে তা হল এগুলি অকেজো করলে শ্বেতকণিকা নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস পায় আর পরিমাণে কম মাত্রায় ফোম সেল তৈরী হয়। এই গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে আর প্রথম ওষুধ বাজারে আসাতে বেশ সময় লাগবে। এর জন্য সর্বোত্তম উপায় হল কম চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা, ধুমপান থেকে বিরত থাকা এবং শরীরচর্চা করে এই সব হৃদরোগগুলি থেকে রক্ষা পাওয়া।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধুমপান থেকে বিরত থাকা, শরীরচর্চা এবং কমচর্বিযুক্ত খাদ্য।- দক্ষিণ আমেরিকায় লোকে চর্বিযুক্ত বিফ আহার করে। কিন্তু সেই সব এলাকার মানুষ খুবই পরিশ্রমী। আমেরিকার কিছু অঞ্চলে এবং মেক্সিকোতে রেড ইন্ডিয়ানদের আমি বিশেষভাবে দেখেছি, আর তাদের হৃদরোগও তুলনামূলক কম আর তারা কম মেদযুক্ত। গবেষণা করে জানা গেছে যে সেখানকার মানুষ খাবারে দই-এর ব্যবহার খুব বেশি করে থাকে। এছাড়াও অলিভ অয়েল ব্যবহার করাও খুব ভাল। আর যে সমস্ত এলাকায় অলিভ অয়েলের উৎপাদন বেশি, সেখানে হৃদরোগ কম দেখা যায়। তবে মানুষ বাড়িতে বসে যেন কেবল খেতেই না থাকে। এখন তো অনেক সহজসাধ্যতা তৈরী হয়েছে। এখন তোমাদেরকে এখান থেকে সামান্য দূর যেতে হলেও গাড়িতে করে যাও। আগেকার দিনে লোকেরা পায়ে হেঁটে দীর্ঘ সফর করত।

আমি যখন ঘানায় ছিলাম, সেখানে এক আহমদী আমাকে বলত, তার বাবা মাসে কমপক্ষে মাসে দুদিন কাজের জন্য এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পায়ে হেঁটে সফর করতেন আর সেই দূরত্ব ছিল সত্তর মাইল। তারা খেতেন আবার শরীর চর্চাও করতেন, পদভ্রমণও করতেন। এখন আমরা খাইদাই আর গাড়িতে বসে চলে যাই। আর চেষ্টা করি বড় গাড়ি নিয়ে প্রভাব দেখানোর,যে দেখ আমাদের কাছে গাড়ি আছে। একথা চিন্তা করি না যে গাড়িতে বসে অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টায় নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছি। এই জন্য সাইকেল চালানো, শরীর চর্চা এবং এই ধরণের অন্যান্য জিনিষও হওয়া চায়। শহরে অশ্বারোহন তোমরা করতে পারবে না, তাই অন্তত সাইকেলটুকু চালাও। ছাত্ররা যদি বেশি হারে সাইকেল চালাতে শুরু করে তবে অনেক উপকার হবে। আমি দেখেছি, যুক্তরাজ্যে অনেকের এর প্রতি আগ্রহ আছে। অনেকের তো এ নিয়ে উন্মাদনা রয়েছে। অনেক ছেলে দশ থেকে কুড়ি কেজি পর্যন্ত ওজন কম করে ফেলেছে আর তাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধুমপানকারীরা এতটাই পাগল যে, যদিও এর উপর এখন সতর্কবাণী থাকছে যে এটি বিষ, তবু তারা ধুমপান করে। এর জন্য আহমদী ছেলেদেরও একটি অভিযান চালানো উচিত যে কেউ যদি ধুমপান করেও থাকে, তবে তাকে বুঝিয়ে তা ছাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। এটি আপনাদের প্রাথমিক গবেষণা। আপাতত আপনারা এটি নিকাশের জন্য এনজিওপ্লাস্টিও করে থাকেন। অনেক সময় বক্র স্থানগুলিতে এটি চলাচলে সমস্যা হয়।

খাদিম উত্তর দেয়, সেখানে আমরা বেলুনিং করে দিই। হুযুর আনোয়ার বলেন, যেখানে বেলুনিং করেও সমস্যা হয়, সেখানে তো আপনারা বাইপাস করেন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে স্টেম সেল দিয়েও কি জট খোলার পদ্ধতি শুরু হয়েছে?

উত্তরে খাদিম বলেন, আজ্ঞে হুযুর, সম্ভবত এ বিষয়ে কাজ হচ্ছে কিন্তু শিরা বা ধমনী সংক্রান্ত হৃদরোগের জন্য কম। হৃদপিণ্ডের পেশির দুর্বলতার ক্ষেত্রে স্টেম সেলের বহুল ব্যবহার রয়েছে, পাকিস্তানের রাবওয়াতেও হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একথা বলা হয় যে হার্টের রুগীর কষ্ট বাড়ে সেহরীর সময়। ডক্টর নূরী সাহেব এবিষয়ে যে নিবন্ধ লিখেছেন, তার ভিত্তি হল 'আল বি যিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব'। যারা তাহাজ্জুদে ওঠেন, নামাযের পর কিছুক্ষণ শরীরচর্চাও করেন, তাদের এই অসুখ কম হচ্ছে।

হুযুর বলেন, মেডিসিন বিভাগে খুব অল্প ছাত্র রয়েছে। ২.৪ শতাংশ। সেক্রেটারী সাহেব উত্তর দেন, বেশি ঝোঁক ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি। হুযুর আনোয়ার বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে আগ্রহ থাকলে কতগুলি বিল্ডিং তৈরী করবে। মানুষ বাঁচলে তবেই না বিল্ডিং এ থাকবে। সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি দেওয়া হচ্ছে, অথচ এদিকে কোনও প্রচেষ্টা নেই।আহমদী ছেলেদের মেডিসিনেও যাওয়া দরকার।

একজন খাদিম গবেষক ছাত্রকে প্রশ্ন করেন যে আমার প্রথম প্রশ্ন হল, আপনাদের লক্ষ্য দুটি প্রোটিন এবং রিসেপ্টর, যা প্রত্যেক কোষে বিদ্যমান। আপনি কিভাবে সমস্ত রিসেপ্টরগুলিকে আটকে রাখবেন?

খাদিম গবেষক উত্তর দেন, মূলত রিসেপ্টরের সংখ্যাও দেখা প্রয়োজন, যা শ্বেতকণিকায় অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে আর রেসেপ্টরও এই দুই প্রকারের।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কোনও অনর্থক বস্তু সৃষ্টি করেন নি। এটাও হতে পারে যে যখন একটি রিসেপ্টর বন্ধ করতে চাইবেন, যেহেতু এন্টিবডিও কাজ করতে থাকে, তাই আমাদের

অনাক্রম্যতা অনেকাংশেই বিকশিত হয়ে যায়। এও দেখা উচিত যে বেশি ক্ষতি কে করছে। প্রথমে সেটিকে টার্গেট করেছে, এরপর হতে পারে যে সেটিকে টার্গেট করলে এন্টিবডি এতটাই সক্রিয় ওঠে যে অন্যদেরকে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল।

প্রশ্নকারী ছাত্রকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি ডাক্তার?

ছাত্রটি উত্তর দেয়, 'আমি মলিকিউলার সাইন্স-এ স্নাকোত্তর কোর্সের ছাত্র।

হুযুর আনোয়ারের আরও প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রটি জানাল, 'আমি প্রস্টেট ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করছি।' হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে এ নিয়ে কি গবেষণা করছ? সাধারণত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পর এই এই রোগ দেখা দেয়।

ছাত্র উত্তর দেয়, পাশ্চাত্যে আমাদের তুলনায় প্রস্টেট ক্যান্সার বেশি। আমরা যারা এশিয়ান, তাদের জেনেটিক্সে প্রস্টেট ক্যান্সারের জিন থাকে না। আমি এন্ড্রোজেন বা পুরুষ হরমোনের বিষয়ে গবেষণা করছি। এটিকে আমরা লক্ষ্যমাত্রা ধরে এগোচ্ছি। কেননা, সেটি প্রস্টেট ক্যান্সারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটিকে যদি আমরা টার্গেট করি, তবে প্রস্টেট ক্যান্সারকে প্রতিহত করা যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, এছাড়াও কি আর কোনও কারণ আছে?

ছাত্রটি উত্তর দেয়, ' এন্ড্রোজেন রিসেপ্টর হলেও এর সঙ্গে আরও অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। অনেকগুলি নির্দেশ-সংবহন পথ আছে। বিভিন্ন গবেষক দল কয়েকটি নির্দেশ-সংবহন পথকে টার্গেট করছে। আমি এন্ড্রোজেন রিসেপ্টর এবং এর সঙ্গে যে হিউথ শট প্রোটিন থাকে, সেটিকে টার্গেট করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আচ্ছা আপনি একটি রিসেপ্টর নিয়ে গবেষণা করছেন, বাকি গুলি নিয়ে কেন এগোচ্ছেন না?

খাদিম বলেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল এন্ড্রোজেন রিসেপ্টর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি তাকে একথাই জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, এন্ড্রোজেন রিসেপ্টর, যেটি আপনাদের প্রধান লক্ষ্য, যদি সেটিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, আর আপনি কাউকেই একশ শতাংশ নিরাময় করতে পারবেন না, যদি তাদের ফলাফল ৬৫-৭০ শতাংশ পাওয়া যায়, তবুও এটি সাফল্য। আপনি এতটুকু করলেও সফল হবেন।

আরও একজন ছাত্র বলেন: আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছি, তার বক্তব্য হল আমাদের যে ইমিউন সেল রয়েছে, ওষুধের প্রভাবে ধীরে ধীরে সেগুলির কার্যকারীতা হ্রাস পেতে থাকে। এই কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত রোগগুলির আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এরফলে ক্ষতি বেশি হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হতে পারে যে কিছু সময়ের জন্য প্রাণ রক্ষা হল। তাদের দাবি, কিছুটা আয়ুও বেড়ে যায় আর জীবনধারণের মান উন্নত হয়। তারা একথা বলে না যে মানুষ অমরত্ব লাভ করবে। এটিতো পরকালে লাভ হবে। অতএব,আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে বেশি মনোযোগ দাও। এজন্যই ডাক্তার নুরী সাহেব একবার বলেছিলেন, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করে, তারা নিজেদের সর্বোচ্চ আয়ু লাভ করে বা অন্ততপক্ষে অস্থির চিত্ত নিয়ে মারা যায় না। যাইহোক এই প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিবেন। আমি তো এমনি সাধারণ কথা বললাম।

ছাত্রটি বলেন, হুযুরের উত্তর একদম সঠিক, আমি নিজের পক্ষ থেকেও এই উত্তর ভেবে রেখেছিলাম। এটি হল প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা মাত্র। শেষশেষ এঞ্জিওপ্লাস্টি এবং সার্জারীই এর চিকিৎসা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: শেষ উপায় তবে সেই সার্জারীই কিম্বা হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করুন, যা আপনার শরীরের অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি করে, প্রখর করে তোলে এবং এরই মাধ্যমে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়। এই কারণেই একে সদৃশবিধান বা সমবিধান বলা হয়। হোমিওপ্যাথিও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করবেন।

এরপর যাহীর আহমদ সাহেব নিজের প্রেজেন্টেশন দেন।

খাদিম ফ্রাইবার্গ-এর টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার ছাত্র হিসেবে অধ্যায়নরত আছেন। তিনি বলেন, 'আমার গবেষণার গবেষণার বিষয় হল পারমাণবিক চুল্লি থেকে পাওয়া অতি মাত্রায় সক্রিয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সম্পর্কে। আমি গবেষণা করছি যে, পেটী বানানোর জন্য উপযুক্ত ধাতু কোনটি, যার মধ্যে এই অতিসক্রিয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে নিরাপদভাবে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমি সিলিকন কার্বাইড নিয়ে গবেষণা করছি।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সেটি যা পারমাণবিক চুল্লিতে ইন্ধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ইন্ধনগুলি দীর্ঘ রডের আকারের হয়। এই রডগুলিকে ব্যবহারের পর চুল্লি থেকে যখন বের করে নেওয়া হয়, তখন সেগুলি প্রচন্ড গরম এবং অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় থাকে। এগুলির তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ রেম (rem) /ঘন্টা হয়ে থাকে। এর তীব্রতার পরিমাণ এভাবে অনুমান করা যায় যে, মানবদেহে যদি ১০০ রেম-এর বিকিরণ দেওয়া হয়,তবে একঘন্টার মধ্যে তার মৃত্যু ঘটবে।

এজন্য এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে পারমাণবিক চুল্লি থেকে বের করা মাত্রই গভীর জলে ফেলে রাখা হয়, যার গভীরতা কমপক্ষে ৪০ ফুট হয়, যাতে এই বর্জ্য দ্রুত ঠান্ডা হয়ে এর বিকিরণের মাত্রা কিছুটা থিতিয়ে আসে। জলাশয়গুলিতে এই বর্জ্যকে কমপক্ষে ৯ মাস এবং সর্বাধিক ১০ বছর পর্যন্ত নিমজ্জিত রাখা হতে পারে।

এরপর বর্জ্যের অধিক তেজস্ক্রিয় অংশগুলিকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়, যাকে রিপ্রসেসিং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বলা হয়। আর অবশিষ্ট অংশকে সিসার সঙ্গে গলিয়ে নিরেট সিসা বানিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ভু-গর্ভের জলকে দূষিত না করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে কাচীভবন বলা হয়।

এই প্রক্রিয়ার পর তেজস্ক্রিয় বর্জ্যগুলিকে তামা বা লোহার পেটীতে ভর্তি করে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গে সমাহিত করা হয়, যার গভীরতা কমপক্ষে ৫০০ মিটার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন যে, এগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আপনারা এটিকে পুনরায় ব্যবহার করেন, তবে পরে এগুলিকে নষ্ট করার জন্য মাটির নীচে কেন রাখা হয়? যার কোনও উদ্দেশ্যই নেই, তা কেন করেন?

এর উত্তরে যাহীর সাহেব বলেন, পৃথিবী এখন বুঝতে পারছে যে এর ক্ষতি বেশি, তাই কিভাবে এর থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, সেই চেষ্টাই করছে। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, যে সমস্ত পেটীতে এগুলির সংরক্ষণ হয়, সেগুলি কি বিকিরণ রোধক?

যাহীর সাহেব বলেন, বর্তমানে আমাদেরকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেটা হল, বর্জ্যগুলো এতটাই তেজস্ক্রিয় যে তামা এবং স্টীলের পেটী খুব তাড়াতাড়ি গলতে শুরু করে। আর হিসেব কষে দেখা গেছে যে ২৫০ থেকে ৩০০ বছরে এগুলি সম্পূর্ণরূপে গলে যাবে। আর এই বর্জ্যের তেজস্ক্রিয়তা ৫০০ থেকে ১০০০ বছর পর্যন্ত বজায় থাকে। এর অর্থ দাঁড়ায় পেটীগুলি গলে যাওয়ার পর পরিবেশে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়বে আর মানুষ ও প্রাণীজগতের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করবে। অতএব এখন প্রয়োজন হল পেটীগুলি যেন এমন ধাতু দ্বারা নির্মিত হয় যা এই বর্জ্যগুলিকে অন্ততপক্ষে ৫০০ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারে।

আমাদের গবেষক দলটি সিলিকন কার্বাইড নিয়ে গবেষণা করছে আমাদের জ্ঞানে এই মুহূর্তে পেটী তৈরীর জন্য এটিই সর্বোত্তম উপকরণ। এর বিশেষত্ব হল-

১) এর দৃঢ়তা তামা এবং স্টীলের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি, কেননা এর মধ্যে যৌথ বন্ধন (covalent bond) থাকে।

২) এটি অনেক বেশি সময় পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা রোধ করতে সক্ষম, কেননা এর উপর অম্ল কিম্বা ক্ষারের কোনও প্রভাব পড়ে না।

৩) আর সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্যটি হল, এর উপাদান বালি ও এবং কার্বন সর্বত্রই সস্তা ও সহজলভ্য। অর্থাৎ এতে পেটী তৈরীর খরচ স্টীল কিম্বা তামার তুলনায় অনেক কম।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের অনুমান, সিলিকন কার্বাইড নির্মিত পেটী বেশি টেকসই এবং স্থায়ী হবে। তাই আমরা বিভিন্ন পারমাণবিক চুল্লির প্রয়োজন অনুসারে সিলিকন কার্বাইড দ্বারা পেটী তৈরী করছি।

যেহেতু প্রত্যেক পরমাণু রিয়েক্টরের বর্জ্যের আকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, তাই এর বর্জ্যের জন্য পেটীও সেই অনুসারেই তৈরী করতে হয়। কিছু রিয়েক্টরের রডের দৈর্ঘ অনেক বেশি হয়, তাই পেটীর আকারও লম্বা করতে হয়।

প্রিয় হুযুর! আমার গবেষণা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হবে। ইনশাআল্লাহ।

১) প্রথম ধাপে পেটীর নমুনা মডেল তৈরী করা হবে এবং

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 26 Nov, 2020 Issue No.48

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সেগুলির ল্যাবরটরী পরীক্ষা হবে।

২) দ্বিতীয় পর্যায়ে কম্পিউটারের সাহায্যে এই পেটী গুলির থ্রিডি নিউমেরিক্যাল মডেল তৈরী করা হবে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মিলিয়ে দেখা হবে যে কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে এই পেটীগুলি সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়।

৩) চূড়ান্ত পর্যায়ে এই সমস্ত পরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা হবে আর অন্যান্য ধাতু দ্বারা নির্মিত পেটীর সঙ্গে তুলনা করে দেখা হবে কোনটি শ্রেয়।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করে, আপনি যে পেটী তৈরী করছেন, সেগুলি কোন বর্জ্যের জন্য? আগে যেগুলি মাটির নীচে রাখা আছে সেগুলির কি হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের দশম কিম্বা ১২তম প্রজন্ম এর ফল ভোগ করবে।

যাহির সাহেব বলেন, এখন যে বর্জ্যগুলি আছে সেগুলি পুনরায় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরে সেগুলিও নতুন পেটীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এগুলি ৫০০ মিটার নীচে রাখা হয়, যদি সেগুলির বিকিরণ শুরু হয়, তবে এতকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠে এত বেশি ছড়িয়ে পড়বে যে এর প্রভাব মানুষের উপরও পড়বে। যেমন ফসল এবং ফলদায়ী গাছপালার উপর এর প্রভাব পড়বে।

যাহির সাহেব বলেন, গাছপালায় বিকিরণ প্রবেশ করবে, তখন সেগুলি ব্যবহার করলে মানবদেহে প্রবেশ করবে কিম্বা পানিতে যদি মিশে যায় আর সেই পানি মানুষ পান করে তবে তার উপর প্রভাব পড়বে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি ভূগর্ভের পানি ব্যবহার করেন, তবে প্রভাব পড়বে। সেই বিকিরণের কিছুটা যদি উপরেও চলে আসতে পারে। নদীর পানি চলমান, কিন্তু সেটি বেঁধে রাখার ফলে সমস্ত বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। নদ-নদীতে পানির স্তর নেমে গিয়েছে কিম্বা বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোথাও হ্রাস পেয়েছে আবার কোথাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক এলাকায় এখন বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে, আর ভূগর্ভের জলস্তরও নীচে নেমে গেছে। তাই পানি পেতে আরও গভীরে যেতে হয়। এরফলেও ক্ষতি হবে। আর এই যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যগুলিকে মাটির নীচে রাখা হচ্ছে, এর প্রভাব সেই সব দেশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না কি পাশ্ববর্তী দেশসমূহেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে?

যাহির সাহেব বলেন, চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এমন জায়গায় এই সব সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয় যেগুলি পার্বত্য অঞ্চল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যেখানে আপাতত জনবসতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। এগুলিকে নতুন পেটীতে রাখবেন না কি পুরোনো পেটীগুলির উপর নতুন পেটী লাগিয়ে দিবেন? কখনও কি এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে যে যতটা উপকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে, পরবর্তী একশ বা দুশ বছর পরের প্রজন্মের কতটা ক্ষতি করবে?

যাহির সাহেব বলেন, কয়েকটি দেশ এর অনুমান করতে শুরু করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষ কেবল নিজের উদরপূর্তি আর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই ভাবিত। জাপানে যে সুনামি এসেছিল তা তাদের অত্যাধুনিক সব পরমাণু চুল্লিগুলিকে তছনছ করে দিয়েছে, যেগুলি থেকে তারা বিদ্যুত উৎপাদন করছিল। সেগুলির পানি বের করা হয়েছে, এর ফলে তেজস্ক্রিয়তা এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে না। এরা তা নিজেদের সুরক্ষা করে ফেলতে পারবে, কিন্তু কোনও সুরক্ষিত পন্থা কেন খুঁজে বের করে না?

গবেষক ছাত্রটি বলেন, তাদের চেষ্টা হল কমপক্ষে পাঁচশ বছর এগুলিকে সংরক্ষণ করার, কেননা পাঁচশ বছর পর এগুলির তেজস্ক্রিয়তা স্তিমিত হয়ে আসে, ততটা বেশি থাকে না। এরপর সেগুলি বাইরে এলে তেমন ক্ষতি করবে না। কিন্তু অল্পবিস্তর ক্ষতি তো হবেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছয়-সাতশ বছর পর নতুন আদম আসবে।.....

এক ছাত্র বলেন, আমি সংবাদ পত্রিকায় একটি নিবন্ধ পড়েছিলাম যাতে বলা হয়েছিল , এই বর্জ্যগুলিকে একটি রকেটে বেঁধে অসীম কালের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ করার ভাবনা বিজ্ঞানীদের রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, উৎক্ষেপনের জন্য কার কাছে রকেট আছে? আমেরিকা, কানাডা এরা উপরে পোঁছে দিতে পারবে। জার্মানীও হয়তো পারবে, এরপর যে বাকী দেশগুলি আছে, তারা যতদিনে উপরে পোঁছবে, ততদিনে মানুষ উপরে পোঁছে যাবে। মানুষকে আশ্বস্ত করতে এরা কেবল ফাঁকা বুলি আওড়ায়। এর মাধ্যমে তারা সমস্ত পরিবেশ তন্ত্রকে নষ্ট করছে। আর এই যে গ্রীন হাউস ইফেক্ট হচ্ছে, এর কারণেই হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্যই ধ্বংস করে ফেলেছে।

যদি শক্তি উৎপাদনের জন্যই বেশি বর্জ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে,তবে সৌরশক্তি যে সব স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে সেখান থেকেও নেওয়া যেতে পারে। জাপানে যে সুনামি এসেছিল, তার কারণে বহু দেশ নিজেদের পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। খবর পাওয়া যাচ্ছে যে জার্মানীও নাকি অনেকগুলি বিদ্যুতকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। প্লান্ট বন্ধ করে কি লাভ হল? তাদের তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলি তো থেকেই গেল। যদি সেগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেগুলিকে তারা কতদূর পর্যন্ত সুরক্ষিত করেছে? কংক্রীটের দেওয়ালও এর থেকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। যে কোনও মুহূর্তে ক্ষতি করতে পারে। অনুরূপভাবে যুক্তরাজ্য এবং আরও অনেক দেশেও আছে। তাই যারা এই প্লান্টগুলি বন্ধ করেছে, এ বিষয়ে সরকার মাটির নীচে দফন করার কি কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে?

গবেষক বলেন, আসল চেষ্টা করা হচ্ছে যে সেগুলিকে এখন যেন চালু না করা হয়। সেখানে যে উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিকে পেটীতে পুরেও সংরক্ষণ করা হয়েছে, পুনরায় ব্যবহার করা হবে না। বাকি প্লান্টগুলি বন্ধ করে এর কোনও বিকল্প নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ, জার্মানীতে এখন আইন তৈরী হয়েছে। এর উপর কাজ হচ্ছে আর এটিকে পুরোপুকি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাঁ বিদ্যুত উৎপাদনও তো করতে হবে, তা কোথা থেকে করবে? শক্তি উৎপাদনের জন্য কোনও উৎস তো থাকতে হবে। রাশিয়ার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, যেখান থেকে ৪০ শতাংশ খনিজ তেল আমদানি হত। বাকি এগুলিও যদি এখানে না থাকে, তবে বাকি কি থাকবে? শেষে প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালাতে শুরু করবে। বায়ুশক্তি চালিত বিদ্যুত উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব নয়, অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, নিউক্লিয়ার টিউবগুলি ব্যবহার করার পর পানিতে ডুবিয়ে ঠান্ডা করা হয়। আমার প্রশ্ন হল, সেই সময় টিউবের তাপমাত্রা কত থাকে আর পানির তাপমাত্রা কত থাকে? আর পানি কতক্ষণ পর্যন্ত বিকিরণ রোধ করতে সক্ষম? আমরা কতক্ষণ পানিতে টিউবগুলি ডুবিয়ে রাখতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আর সেই পানি কোথায় যায়?'

যাহির সাহেব বলেন, এর তেজস্ক্রিয়তা থাকে ঘন্টায় ১০০০০ হাজার রেম। খুব কম করে হলেও নয় মাস পর্যন্ত সেটিকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যে পানিতে সেটি ডুবিয়ে রাখা হবে, একটা সময় পর সেই পানি কি তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত হবে, পানি পরিস্কার হয়ে যাবে?

যাহির সাহেব বলেন, এর মধ্যে আরও জল পরিশোধন যন্ত্র যুক্ত থাকে। (ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir